সম্পূরক কৃষিশিক্ষা

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সম্পূরক কৃষিশিক্ষা হিসেবে নির্ধারিত

সম্পূরক কৃষিশিক্ষা

ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি

রচনা

ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা
ড. শাহাবুদ্দিন আহমেদ
ড. মিয়া সাঈদ হাসান, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এনডিসি
প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান, ড. মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ নাজমুল হাসান
শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন, ড. শাহ্ মোঃ জিকরুল হক চোধুরী
ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম, ড. এ কে এম শামীম আলম
মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক সংকলিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা–১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৮

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ মূলত কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার জন্য অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান কৃষি ক্ষেত্রে অনেক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত যুবসমাজকে আধুনিক কৃষির প্রতি আগ্রহী করার কৌশল নির্ধারনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য **'সম্পূরক কৃষি শিক্ষা'** নামে পাঠ্যপুস্তকটি সংকলন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক অত্র পাঠ্যপুস্তকটি সংকলন করা হয়েছে। আশা করা যায় এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদেরকে কৃষির তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সংকলন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	**কৃষি প্রযুক্তি:** গম চাষের আধুনিক প্রযুক্তি	১-৬
দ্বিতীয়	**সবজি চাষ:** সবজির চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরি হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও ফুল চাষ গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন কলাকৌশল বসতবাড়িতে সবজি চাষ বহুস্তর বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সবজি চাষ ছাদে সবজি, ফল ও ফুল চাষ বা রুফটপ গার্ডেনিং	৭-২১
তৃতীয়	বাংলাদেশের ফল পরিচিতি	২২-২৭
চতুর্থ	ফসল উৎপাদনে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) অনুসরণ	২৮-২৯
পঞ্চম	**কৃষি উপকরণ:** সার, সেচ এবং কলস সেচ	৩০-৩৯
ষষ্ঠ	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ	৪০-৪৪
সপ্তম	পুকুরে পাঙ্গাস মাছ চাষের উন্নত কলাকৌশল	৪৫-৪৮
অষ্টম	গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগী পালন গবাদিপ্রাণির রোগব্যাধি	৪৯-৫৫
নবম	নিরাপদ খাবার	৫৬-৫৮
দশম	কৃষি প্রতিষ্ঠান পরিচিতি কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫৯-৬৪

প্রথম অধ্যায়
কৃষি প্রযুক্তি

গম চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

গম বাংলাদেশে ধানের পরই দ্বিতীয় প্রধান দানা জাতীয় খাদ্যশস্য। গম একটি শীতকালীন ফসল যা রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। গত ২০১৪-১৫ মৌসুমে বাংলাদেশে প্রায় ৪.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের চাষ হয়েছে এবং উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৩.৪৮ লক্ষ টন। বর্তমানে দেশে গমের চাহিদা প্রায় ৪৫ লক্ষ টন। তাই দেশের চাহিদা মেটাতে বছরে অন্তত ৩০ লক্ষ টন গম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। গম চাষাবাদের জন্য ধানের তুলনায় পানি সেচ অনেক কম লাগে।

চিত্রঃ গম গাছের ছবি

চিত্রঃ গমের দানার ছবি

উন্নত জাত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে গমের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উন্নত জাত

সম্প্রতি উদ্ভাবিত গমের জাতগুলোর জীবনকাল, ফলন ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলোঃ

জাতের নাম	উদ্ভাবনের বছর	জীবনকাল	হেক্টরপ্রতি ফলন	বৈশিষ্ট্য
বারি গম ২৫	২০১০	১০২-১১০ দিন	৩.৬-৫.০ টন	তাপ ও লবণ সহনশীল
বারি গম ২৭	২০১২	১০৫-১১০ দিন	৪.০-৫.৪ টন	তাপসহিষ্ণু
বারি গম ২৮	২০১২	১০২-১০৮ দিন	৪.০-৫.৪ টন	স্বল্পমেয়াদি
বারি গম ২৯	২০১৪	১০৫-১১০ দিন	৪.০-৫.৫ টন	কাণ্ড শক্ত ও গাছ খাটো
বারি গম ৩০	২০১৪	১০০-১০৫ দিন	৪.৫-৫.৫ টন	স্বল্পমেয়াদি

গম বপনের উপযুক্ত সময়

গম বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের শেষ ২ সপ্তাহ । যে সমস্ত এলাকায় আমন ধান কাটতে দেরি হয় বা জমি তৈরিতে দেরি হয় সেসব এলাকায় গমের তাপ সহনশীল জাত যেমন বারি গম ২৫, লবণ সহনশীল বারি গম ২৮ বা স্বল্পমেয়াদি জাত বারি গম ৩০ চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার ও বীজ শোধন

শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা আছে এরূপ বীজ প্রতি হেক্টর জমিতে শোধিত ১২০ কেজি হারে বপন করতে হবে।

বপন পদ্ধতি

জমিতে 'জো' এলে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সে.মি. পর পর সারিতে এবং ৪-৫ সে.মি. গভীরে বীজ বুনতে হবে। পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন ও মইয়ের কাজ করা যাবে। সারিতে বপন করলে নিড়ানিসহ বিভিন্ন আন্তঃপরিচর্যার কাজে সুবিধা হয়। বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

শেষ চাষের সার প্রয়োগ

ছিটিয়ে বীজ বপন

সারিতে বীজ বপন

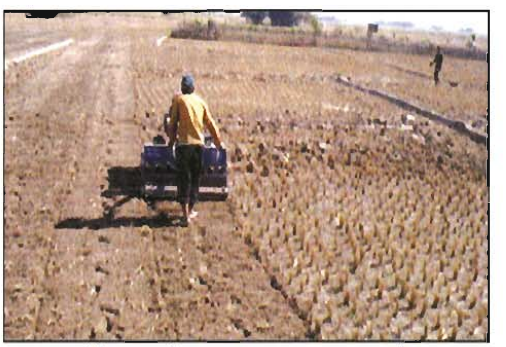

পাওয়ার টিলার চালিত বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন

পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে গম বপন

বীজ ঢেকে দেয়ার পর জমির ঢাল অনুযদায়ী বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পনি নিষ্কাশনের জন্য ২০-২৫ ফুট অন্তর অন্তর নালা কেটে রাখুন

সার প্রয়োগ

গম চাষে পর্যাপ্ত জৈবসারসহ সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। জৈবসার প্রয়োগ করার পর শেষ চাষের পূর্বে দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি (ফসফেট), পটাশ, জিপসাম এবং বোরন সার দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া বপনের ১৭-২১ দিন পর বা চারার তিন পাতা অবস্থায় প্রথম সেচের পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মধ্যম উর্বর জমিতে উচ্চ ফলনের জন্য গম চাষে বিভিন্ন সারের পরিমাণ পাশের সারনিতে দেয়া হলো:

সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সমস্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে অম্লমান (pH) ৫.৫ এর কম হলে হেক্টরপ্রতি ১ টন হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টরে)
ইউরিয়া	২৪০ কেজি
টিএসপি	১২৫ কেজি
এমপি	১২৫ কেজি
জিপসাম	১২৫ কেজি
বরিক এসিড	৭ কেজি
গোবর/কম্পোস্ট	৬০০০ কেজি

সেচ প্রয়োগ

মাটির প্রকারভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে।

১ম সেচ: বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় সেচ: শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর)

তৃতীয় সেচ: দানা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে (বপনের ৭০-৭৫ দিন পর)

আগাছা দমন

বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিতে হবে। আগাছা দমনের জন্য এফিনিটি নামক আগাছানাশক প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। প্রথম সেচের পর 'জো' এলে বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম এফিনিটি পাউডার মিশিয়ে পাঁচ শতক জমিতে স্প্রে করতে হবে। সময়মতো আগাছা দমন করলে ফলন ১৫% বৃদ্ধি পায়।

প্রথম সেচের পর জমিতে জো আসলে নিড়ানি দিয়ে আগাছা বাছাই

অন্য জাত বাছাইকরণ বা রোগিং

কোনো নির্দিষ্ট জাতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য বীজ গমের জমি থেকে অন্য জাতের মিশ্রণ, অন্য ফসল ও আগাছা বাছাই করাই হলো রোগিং (Roguing)। বীজ গমের ক্ষেতে শীষ বের হওয়ার পর থেকে শুরু করে গাছ পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত ২-৩ বার রোগিং করতে হবে।

ফসল/বীজ সংগ্রহ

গম গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কাটতে হবে। এ সময় হাতের তালুতে শীষ নিয়ে ঘষলে গমের দানা বের হয়ে আসবে। রোদের দিনে সকালের দিকে গম কেটে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে মাড়াই করা উত্তম।

বীজ সংরক্ষণ

বীজ দানা পর পর ২-৩ দিন রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। সংরক্ষণের সময় বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে থাকতে হবে। বীজ দাঁতে দিয়ে চিবানোর সময় 'কট' করে শব্দ করে ভেঙে গেলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। ধাতব বা প্লাস্টিক ড্রাম, পলিথিন ব্যাগ ও প্লাস্টিক বস্তা বীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম। বীজ দ্বারা পরিপূর্ণ করে পাত্রের মুখ বায়ুরোধীভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে।

চিত্র: **বীজ সংরক্ষণ**

বালাই দমন

ইঁদুর গমের প্রধান শত্রু। শীষ আসার পর গমে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হয়। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা হাতে তৈরি বা বাজার থেকে কেনা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরাট) ব্যবহার করে দমন করতে হবে। এসব বিষটোপ সদ্য মাটি তোলা গর্তে বা চলাচলের রাস্তায় পেতে রাখতে হয়। নতুন গর্তে ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে ইঁদুর দমন করা যায়। তাছাড়া গর্তে পানি বা ধোঁয়া দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়।

গমে ছত্রাকজনিত কয়েকটি রোগ দেখা দিতে পারে। ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ, পাতার মরিচা রোগ, শীষের ব্লাইট রোগ এবং বীজের কালো দাগ রোগ (চিত্র ১-৪) অন্যতম।

পাতা ঝলসানো রোগে প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকার বাদামি দাগ পড়ে। পরে দাগ আকারে বেড়ে পাতা ঝলসে যায়। পাতার মরিচা রোগে প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট গোলাকার ফোস্কার মতো লালচে বাদামি মরিচা দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছের পাতায় হাত ঘষলে মরিচার মতো গুড়া হাতে লাগে। শীষের ব্লাইট রোগের ফলে আক্রান্ত শীষে সাধারণত ১-২টি স্পাইকলেট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আক্রান্ত স্পাইকলেট ও বীজ কালো রঙ ধারণ করে ।

চিত্র ১:
গমের পাতা ঝলসানো রোগ

চিত্র ২:
পাতার মরিচা রোগ

চিত্র ৩:
শীষের ব্লাইট রোগ

চিত্র ৪:
গম বীজের কালো রোগ

গমের এসব ছত্রাকজনিত রোগ দমনের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণীয়:

ক) গমের রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন- বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বারি গম ২৭, বারি গম ২৮, বারি গম ২৯ এবং বারি গম ৩০ ইত্যাদি চাষ করা।
খ) রোগমুক্ত বীজ বপন।
গ) উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন।
ঘ) অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ, সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা এবং আগাছা দমন।
ঙ) যথাযথ ছত্রাক নাশকের মাধমে বীজ শোধনপূর্বক বীজ বপন।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গম চাষ

ক) পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ

আমন ধান কাটার পর মাটির 'জো' অবস্থায়, জমিতে সার দিয়ে এ যন্ত্রের সাহায্যে একই সাথে চাষ, সারিতে বীজ বপন করা যায় । এ যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় এক বিঘা জমিতে গম বপন করা যায়। স্বল্প সময়ে বীজ ও কম খরচে গম বীজ বপনের জন্য এ যন্ত্রটির প্রসার হচ্ছে।

খ) পাওয়ারটিলার চালিত বেড প্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ

মাটিতে রস থাকা অবস্থায় এ মেশিনের সাহায্যে একই সাথে বেড তৈরি এবং বীজ বপন করা যায়। আমন ধান কাটার পর মাটির 'জো' অবস্থায় জমিতে সার দিতে হবে। তারপর এ মেশিনের সাহায্যে একই সাথে বেড তৈরি এবং প্রতি বেডে দু'টি লাইনে বীজ বপন করা যায়। এ পদ্ধতিতে বীজের পরিমাণ ১৫-২০% কম লাগে, ফলন ৫-২০% বেশি হয় এবং সেচের পানি সাশ্রয় হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ৩০ শতক জমিতে বেড প্লান্টিং পদ্ধতিতে গম বীজ বপন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সবজি চাষ

সবজির চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরি

সবজির চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারা উৎপাদন করে যেসব সবজি ও মসলার চাষ করা হয় তার মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচ ও পেঁয়াজ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আগাম শীতকালীন, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন চারা উৎপাদন প্রসার লাভ করছে। চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা তৈরিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

বীজতলার উপকারিতা

- অল্প জায়গা লাগে।
- চারার যত্ন ও পরিচর্যা করা সহজ হয়।
- আগাম চারা উৎপাদন করে মূল জমি থেকে পানি নেমে যাবার পরপরই আগাম সবজি উৎপাদন করা যায়।
- চারা রোপণের মাধ্যমে জমির সর্বত্র সমান সংখ্যক গাছ রাখা সম্ভব হয়।
- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

বীজতলা তৈরির উপকরণ

- সুনিষ্কাশিত উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ সমৃদ্ধ মাটি, উত্তমরূপে পচানো গোবর/কম্পোস্ট ও টিএসপি সার।
- বীজতলা ঢেকে দেয়ার জন্য কলাপাতা অথবা পলিথিন, বাঁশের বাতা অথবা কঞ্চি।
- কেরোসিন, ছাই, চুন, তুঁতে, কীটনাশক ইত্যাদি।
- ভালো গুণসম্পন্ন বীজ।
- দা, কোদাল, শাবল ইত্যাদি।

বীজতলা তৈরির পদ্ধতি (১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট প্রস্থ আকারের ১টি বীজতলা তৈরির জন্য)

- জমির মাটি গভীরভাবে চাষ দিয়ে অথবা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। তারপর আইল হতে ৯ ইঞ্চি দূরে ১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩ ফুট চওড়া আকারে মাপ দিয়ে চার পাশ থেকে ৪ ইঞ্চি গভীর করে মাটি তুলে বেডের উপর বিছিয়ে দিতে হবে যাতে নালা থেকে বেড ৬ ইঞ্চি উঁচু হয়, এতে বেড হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হবে না এবং জমির আন্তঃপরিচর্যা করতে সুবিধা হবে।

- মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট (২ঃ১ঃ১ অনুপাতে) মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়।
- মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেয়াই ভালো। উর্বরতা কম হলে উক্ত মাপের বীজতলার মাটিতে ১০০ গ্রাম টিএসপি সার বীজ বপনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে মিশাতে হবে।
- বীজ বপনের কয়েকদিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সে. মি. গভীর করে ঝুরঝুরা, উপরিভাগ মসৃণ এবং সমান ও ঢেলামুক্ত করে তৈরি করতে হবে।
- এরপর বীজতলার উপরিভাগে সমানভাবে বীজ বপন করতে হবে এবং বীজের উপর ঝুরঝুরে মাটি চালনির দ্বারা চেলে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপন

- বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সে.মি.) কাঠি দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়।

চিত্রঃ টমেটোর বীজতলা

- শুকনো মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেয়া মাটির জো অবস্থা এলে বীজ বপন করতে হয়।
- যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণত বোনার পূর্বে পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাত ভিজিয়ে বপন করতে হয়। (যেমন- লাউ, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, করলা, উচ্ছে ও ঝিঙ্গা)

বীজতলায় চারা উৎপাদন ও চারার যত্ন

- চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভালো। তবে যদি চারার বৃদ্ধি কম হয় বা চারা হলুদ হয়ে যায় তখন প্রতি ১ বর্গমিটার জায়গায় ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম জিপসাম ছিটিয়ে দিয়ে সাথে সাথে পানি দিতে হবে। এতে চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

- চারা অবস্থায় কাণ্ডের গোড়ায় পচন রোগ দেখা যায়। একে ডাম্পিং অফ বলে। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী। বীজতলার মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশি হয়।
- এ জন্য বীজতলার মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে ক্যাপটান, কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ (১-২ গ্রাম প্রতি লিটার) পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালো করে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।
- এছাড়াও সৌরতাপ, পোলট্রি রিফিউজ ও খৈল ব্যবহার করেও ডাম্পিং অফ থেকে চারাকে রক্ষা করা যায়।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও ফুল চাষ

আধুনিক কৃষিতে হাইড্রোপনিক একটি সময়োপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল উৎপাদন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অতি লাভজনক ফসল মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি অপ্রতুল সেখানে মাটির পরিবর্তে ঘরের ছাদে বা আঙিনায়, পলিটানেল, নেট হাউজে বা গ্রীন হাউজে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সারা বছরই ফসল উৎপাদন করা সম্ভব এবং উৎপাদিত ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ফলে এ ফসল নিরাপদ এবং এর বাজারমূল্যও অধিক।

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে মাটি বিহীন বড় স্টিলের বা প্লাস্টিকের ট্রেতে গাছের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে সাফল্যজনকভাবে ক্যাপসিকাম উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, এ পদ্ধতিতে ফলন দ্বিগুণ হয় এবং উৎপাদন খরচও কম হয়।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত টমেটোর জাতগুলোর মধ্যে নিম্নোল্লিখিত জাতগুলো চাষ করা যেতে পারে। যেমন - বারি টমেটো ১৪, বারি টমেটো ১৫ (শীতকালের জন্য), বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, বারি হাইব্রিড টমেটো ৫ (গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের জন্য)। এছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির আমদানিকৃত কিছু ভালো জাতও বাংলাদেশে চাষ করা যেতে পারে। সাধারণত টমেটোর জীবনকাল ১২০-১৫০ দিন হয়ে থাকে। ফোমের মধ্যে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শীতকালের জন্য) এবং মে-জুলাই (গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের জন্য) মাসে বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চিত্রঃ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ

চিত্র: হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ

চারা উৎপাদন

চারা উৎপাদনের জন্য স্পঞ্জ ব্লক ব্যবহার করা হয়। ৩০X৩০ সে.মি. সাইজের একটি স্পঞ্জ-কে ২.৫-২.৫ সে.মি. সাইজে ব্লক ব্লক করে কেটে প্রতিটি ব্লকের মাঝে ছিদ্র করে বীজ স্থাপন করতে হবে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বীজের উপরে কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। চারা অঙ্কুরিত হওয়ার পর পরই ঐ কাগজ সরিয়ে ফেলতে হবে। চারার বয়স ২০-২৫ দিন হলে স্পঞ্জ ব্লকসহ চারা বালতি/ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে।

রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ (প্রতি ১০০০ লিটার পানির জন্য)

ক্রমিক নং	রাসায়নিক উপাদান	পরিমাণ	ক্রমিক নং	রাসায়নিক উপাদান	পরিমাণ
১	পটাশিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট (KH_2PO_4)	২৭০ গ্রাম	৬	ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4.4H_2O$)	৬.১০ গ্রাম
২	পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3)	৫৮০ গ্রাম	৭	বরিক এসিড (H_3BO_3)	১.৮০ গ্রাম
৩	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট $Ca(NO_3)_2.\ 4H_2O$	১০০০ গ্রাম	৮	কপার সালফেট ($CuSO_4.5H_2O$)	০.৪০ গ্রাম
৪	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4.7H_2O$)	৫১০ গ্রাম	৯	অ্যামনিয়াম মলিবডেড ($(NH_4)_6Mo_7\ O_{24}.4H_2O$)	০.৩৮ গ্রাম
৫	ইডিটিএ আয়রন (EDTAIron)	৮০ গ্রাম	১০	জিংক সালফেট ($ZnSO_4.7H_2O$)	০.৪৪ গ্রাম

পরবর্তী পরিচর্যা বা EC ও P^H এর মান নিয়ন্ত্রণ

বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (Electrical Conductivity) EC হলো কোনো দ্রবণে দ্রবীভূত পদার্থসমূহের পরিমাণ যার উপর বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। চারা লাগানোর সময় দ্রবণের ইসি এর মান ০.৭৫-১.০ WGm/wg এবং P^H ৫.৫-৬.০ মধ্যে রাখতে হবে। চারা রোপণের ১ মাস পর ইসি এর মান ০.৭৫-১.৫ ডিএস/মি এর মধ্যে রাখতে হবে। P^H এর মান সব সময় ৫.৫-৬.৫ এর মাঝে রাখতে হবে। ইসি বেশি হলে বিশুদ্ধ পানি যোগ করে ইসি কমাতে হবে। ইসি কমে গেলে খাদ্যউপাদান সমেত জলীয় দ্রবণ যোগ করতে হবে।

P^H বাড়লে সাধারণ এসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা ফসফিউরিক এসিড যোগ করতে হয়। P^H কমে গেলে সোডিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড যোগ করতে হবে। গাছে দৈহিক বৃদ্ধির পর্যায়ে হঠাৎ করে P^H বা ইসি পরিবর্তন করা যাবে না। গাছকে খাড়া রাখার জন্য নাইলনের রশি দ্বারা গাছ বেঁধে দিতে হবে।

ফলন : জাত ভেদে ৫০-৯০ টন / হেক্টর।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন কলাকৌশল

বাংলাদেশে টমেটো অতি জনপ্রিয় শীতকালীন ফসল। টমেটো চাষের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া শীতকালে বিদ্যমান। টমেটোর জনপ্রিয়তা ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কিছু গ্রীষ্মকালীন টমেটোর জাত উদ্ভাবন করেছে যা গ্রীষ্মকালে ফলন দিতে সক্ষম। তবে বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলিথিনের ছাউনিতে চাষাবাদ করতে হবে।

নিম্নে পলিথিনের ছাউনিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

- গ্রীষ্মকালীন জাত : বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, বারি হাইব্রিড টমেটো ৫, বারি হাইব্রিড টমেটো ৮।
- গ্রীষ্মকালীন টমেটো বীজ বপনের সময় : মে।

  বীজের হার : ২০০ গ্রাম /হেক্টর
- বীজতলায় ৪০-৬০ মেস (প্রতি ইঞ্চিতে ৪০-৬০টি ছিদ্রযুক্ত) নাইলন নেট দিয়ে ঢেকে চারা উৎপাদন করলে চারা অবস্থায়ই সাদা মাছি পোকার দ্বারা পাতা কোকড়ানো রোগ ছড়ানোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলে সুস্থ-সবল ও ভাইরাসমুক্ত চারা রোপণ করে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।
- পলিথিনের ছাউনিতে এসব জাতের আবাদ করতে হয়। ২.৩০ মি. চওড়া (মাঝে ৩০ সে.মি. নালাসহ) ২টি বেডে লম্বালম্বিভাবে একটি করে ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাউনির দু'পাশে উচচতা ১.৩৫ মি. ও মাঝখানের উচচতা ১.৮০ মি. হয়ে থাকে। ছাউনির জন্য ০.১০ মি.মি. পুরু পলিথিন ব্যবহার করাই উত্তম।

চিত্র: গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন কলাকৌশল

- চারা লাগানোর পূর্বেই জমিতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে ছাউনি দিতে হয়। ছাউনির জন্য বাঁশ, স্বচ্ছ পলিথিন, নাইলনের দড়ি ও পাটের সুতলি প্রয়োজন। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়ে না যায় সেজন্য ছাউনির উপর দিয়ে উভয় পাশ থেকে আড়াআড়িভাবে দড়ি পেঁচানো হয়ে থাকে।
- পাশাপাশি দুই ছাউনির মাঝে ৫০ সে.মি. চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন সহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। জমি থেকে বেডের উচ্চতা ২০-২৫ সে.মি. হতে হবে। প্রতিটি ছাউনিতে ২টি বেডে ৪টি সারি থাকবে। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতি বেডে ২ সারি করে ৫০ সে.মি. দূরত্বে রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	জমি তৈরির সময়	১ম উপরি প্রয়োগ (চারা লাগানোর ১০ দিন পর)	২য় উপরি প্রয়োগ (চারা লাগানোর ২৫ দিন পর)	৩য় উপরি প্রয়োগ (চারা লাগানোর ৪০ দিন পর)
পচা গোবর	১০ টন	১০ টন	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	১৭৫ কেজি	-	-	-
এমপি	১৫০ কেজি	১০০ কেজি	-	৯০ কেজি	৬০ কেজি

- **অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা**

ঠেকনা দেওয়া: পরিচর্যার সুবিধার্থে এবং প্রবল বাতাসে গাছ যাতে নুয়ে না পড়ে সে জন্য ঠেকনা দিতে হবে।

পার্শ্বকুশি ছাঁটাই : প্রথম এবং দ্বিতীয় বার সার প্রয়োগের পূর্বে পার্শ্বকুশিসহ মরা পাতা ছাঁটাই করে দিতে হবে। এতে কীটপতঙ্গ ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয় এবং ফলের আকার বড় হয়।

কৃত্রিম হরমোন ফোটা ফুলে স্প্রে করা :

- গ্রীষ্মকালীন টমেটো গাছে হরমোন স্প্রে ছাড়াই ফুল ফুটে ও ফল ধরে। তবে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে 'টমাটোটন' নামক কৃত্রিম হরমোন (CPA) ২০ মি.লি. ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছোট সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে ৭-৮ দিন পর দ্বিতীয় বার সদ্য ফোটা ফুলে স্প্রে করতে হয়।

চিত্র: কৃত্রিম হরমোন স্প্রে

- প্রচুর ফুল ধরলেও উচ্চ তাপমাত্রা পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটায়। সাধারণত যখন গাছে প্রচুর ফুটন্ত ফুল দেখা যায় তখন স্প্রে করতে হয়।

- স্প্রে সাধারণত সকালে বা পড়ন্ত বিকালে করা হয়। গাছপ্রতি ২৫-৩০টি ফল ধরলে সেই ফলগুলোর আকার ভালো হয়। এর বেশি ফল রাখলে ফলের আকৃতি ছোট হয়ে যায়।

- **ফসল সংগ্রহ :** চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে পাকা টমেটো সংগ্রহ শুরু হয়। প্রতি গাছ থেকে ৩-৪ সপ্তাহ ধরে ৫-৬ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপন্ন টমেটো বীজবিহীন হয়।

- **ফলন :** গাছপ্রতি ফলন ১.৫-২.০ কেজি; হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪৫ টন।

বসতবাড়িতে সবজি চাষ

অনেক সময়ে বাড়ির আশপাশ ফাঁকাই থেকে যায় কিংবা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই দু'-চার রকমের সবজির গাছ জন্মানো হয়। অথচ বসতবাড়ির আঙিনা সারা বছরই বিভিন্ন শাকসবজি আবাদের জন্য উপযোগী অবস্থায় থাকে। তাই এসব বসত বাড়িতে পরিকল্পনামাফিক চাষ করতে পারলে সহজেই বসতবাড়িতেই পরিবারের চাহিদা মিটানোর মতো সবজি উৎপাদন করা সম্ভব।

চিত্র: বসতবাড়িতে সবজি চাষ

বসতবাড়িতে সবজি চাষ করার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

- অল্প পরিমাণ জমিতেও অনেক প্রকারের ও বহু সংখ্যক শাকসবজির গাছ জন্মানো যায়।
- শাকসবজির ফসল পেতে বেশি সময় লাগে না, তাই একই জমিতে বছরে কয়েক বার ফসল জন্মানো সম্ভব।
- পুষ্টির দিক থেকে অধিকাংশ শাকসবজি উঁচুমানের হয়ে থাকে। শাকসবজির পুষ্টি উপাদানের মধ্যে ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ, লৌহ ও ক্যালসিয়াম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত পরিমাণে শাকসবজি খেলে পুষ্টিহীনতা দূর করা যায়, আবার খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থেও অভাবে যেসব অসুখ-বিসুখ দেখা দেয় সেসব থেকেও মুক্ত থাকা সম্ভব হয়।
- বেশি পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদন করতে পারলে, কেবল যে পরিবারের প্রয়োজন মেটে তাই নয়, বাড়তি ফসল বিক্রি করে পরিবারে একটা বাড়তি আয়ও আসতে পারে।
- পরিবারের লোকেরা নিজেরাই বসতবাড়ির বাগানে কাজ করে অবসর সময় কাটাতে পারেন।

বসতবাড়িতে সারা বছর সবজি উৎপাদনের জন্য সবজিবিন্যাস

২০১৫ সবজি বাগানের পাঁচ খণ্ড জমিতে বা বেডে যে পাঁচটি সবজিবিন্যাস অনুসরণ করা হয়, এখানে সেগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো:

প্রথম খণ্ডের বিন্যাস	মুলা/টমেটো-লালশাক-লালশাক-পুঁইশাক
দ্বিতীয় খণ্ডের বিন্যাস	লালশাক+বেগুন-লালশাক-ঢেঁড়শ
তৃতীয় খণ্ডের বিন্যাস	পালংশাক-রসুন/লালশাক-ডাঁটা-লালশাক
চতুর্থ খণ্ডের বিন্যাস	মুলাশাক-পেঁয়াজ বা গাজর-কলমীশাক-লালশাক
পঞ্চম খণ্ডের বিন্যাস	বাধাকপি-লালশাক-করলা-লালশাক

প্রথম খণ্ড : মুলার বীজ সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে বপন করতে হবে। মুলা শেষ বারের মতো ওঠানোর ১০-১২ দিন আগেই টমেটোর চারা রোপণ করতে হবে। টমেটো ওঠানো শেষ হলে পর পর দু'বার লালশাক চাষ করে, পরে পুঁইশাক চাষ করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড : লালশাক ও বেগুন সাথি ফসল হিসেবে চাষ করতে হবে। বেগুন শেষ বারের মতো ওঠানোর পর, সেখানে আবার লালশাক বুনতে হবে। লালশাকের পর ঢেঁড়স লাগাতে হবে সারি করে।

তৃতীয় খণ্ড : পালংশাক চাষের পর রসুনের আবাদ করতে হবে, রসুন তোলার পূর্বে লালশাকের বীজ বুনতে হবে। এরপর ডাঁটা লাগিয়ে, তা তোলার পর আবার লালশাকের চাষ করতে হবে।

চতুর্থ খণ্ড : মুলাশাক তোলার পর পেঁয়াজের চারা রোপণ করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে পেঁয়াজের পরিবর্তে গাজরের আবাদ করা যেতে পারে। পেঁয়াজ বা গাজর ওঠানোর পর কলমিশাকের আবাদ করে, পরে লালশাক উৎপন্ন করা যাবে।

পঞ্চম খণ্ড : সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বাঁধাকপির চারা রোপণ করে, জানুয়ারি মাসের দিকে বাঁধাকপি সংগ্রহ শেষ করে লালশাক বুনতে হবে। লালশাক তোলার পর করলার চাষ করে, পরে আবার লালশাক চাষ করতে হবে।

বাগানের কিনারায় সবজি : উল্লিখিত খণ্ডগুলো ছাড়াও বাগানের কিনারায় বেড়া দিয়ে ভিতরের দিকে রোপণ করে বেড়াকে বাউনি হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন লতা-জাতীয় সবজি চাষাবাদ করা যাবে। বেড়ার পাশে যে জায়গা রাখা হয়েছে সেখানে মৌলভীকচু, মানকচু, মুখীকচু ইত্যাদি রোপণ করা যাবে। তাছাড়া বাগানের কিনারায় একটি করে পেঁপে গাছ লাগানো যাবে। এভাবে একদিকে যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ইত্যাদির উপদ্রব থেকে বাগানের সবজিগুলোকে রক্ষা করা যাবে, অপরদিকে সবজিবিন্যাসের বাইরে কতকগুলো সবজি উৎপাদন করা যাবে।

এভাবে সারা বছর বসতবাড়িতে সবজি চাষ করে পরিবারের পুষ্টি প্রয়োজন মিটবে তাই নয়, বাড়তি ফসল বিক্রি করে পরিবারে একটা বাড়তি আয়ও আসবে।

বহুস্তর বিশিষ্ট পদ্ধতিতে সবজি চাষ

বহুস্তর বিশিষ্ট সবজি বাগানে একাধিক স্তর থাকে। এ ধরনের বাগানে বিভিন্ন ধরনের সবজি হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এরূপ একটি বাগানে মাচাতে লতানো সবজি (লাউ, শিম ইত্যাদি) চাষের পাশাপাশি তার নিচে দ্বিতীয় মাচা করে তাতে অল্প আলোতে হয়, এমন সবজি (পুঁইশাক) চাষ করা, তার নিচে মাটিতে

ছায়া সহ্যকারী ফসল (আদা, হলুদ) চাষ করা এবং মাচার উপরে অল্প ছায়া দেয় এমন সবজি (পেঁপে) চাষ করা, আবার বেড়ায় লতা জাতীয় সবজির চাষ করা যায়।

এভাবে এরূপ বাগানে সম্মিলিতভাবে সবজির চাষাবাদ পদ্ধতি কাঠামো অনুসৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি বসতবাড়িই এক একটি অপরিকল্পিত বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান বা বহুস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ কেন্দ্র। কারণ দেশজ সব ধরনের ফল, শাকসবজি, জ্বালানি এবং আসবাবপত্র তৈরির কাঠ আসে বসতবাড়ি, আঙ্গিনা ও ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড থেকে। ভূমি সংলগ্ন লতাপাতাসমৃদ্ধ নিম্নস্তর, বৃক্ষসমৃদ্ধ উচ্চস্তর এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্তর নিয়েই বসতবাড়ির বহুস্তর বাগান। নিম্নস্তরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে ১টি এর কম উচ্চতাবিশিষ্ট সর্বনিম্নস্তরে শাকসবজি ও ঔষধি গাছ এবং ১-৩ মিটার উচ্চতায় কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, আলু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। উপরের স্তরটিও দুটি ভাগে ভাগ করে ২৫ মিটার বেশি উচ্চতার সুউচ্চ কাঠ ও ফল বৃক্ষ এবং ১০-১২ মিটার উচ্চতায় মাঝারি উচ্চতার ফল ও কাষ্ঠল উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে।

বহুস্তর বিশিষ্ট সবজি বাগানের উদ্দেশ্য -

১. ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা।
২. সারা বছরব্যাপী সবজি চাষের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. জাতীয় উৎপাদন বাড়ানো।

বহুস্তর বিশিষ্ট সবজি বাগানের সবজি নির্বাচন

বহুস্তর বিশিষ্ট সবজি বাগানের সবজি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে -

১. বাগানে লাগানোর জন্য ছায়া পছন্দকারী বা ছায়া সহ্যকারী সবজি/উদ্ভিদ/ ফসল চিহ্নিত করতে হবে।
২. নির্বাচিত সবজি এমন সমন্বয়ে হবে যেন ফসল উৎপাদন চক্র সারা বছর নিয়মিত উৎপাদন বজায় থাকে।
৩. সারা বছর কম-বেশি সবজি পাওয়া যাবে।
৪. বাগানে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।
৫. পারিবারিক সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমেই বাগানের ফসল পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পন্ন হবে।

২০১৯

বহুস্তর বিশিষ্ট সবজি বাগানের পরিচর্যা

সর্বাধিক এবং সারাবছর ফলন পেতে বহুস্তর বিশিষ্ট বাগানের সবজি গুরুত্বপূর্ণ। ফসল বা সবজি লাগানো থেকে সর্বশেষ ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সঠিক পরিচর্যা করলে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এ ধরনের বাগানে যে সবজিরই চাষ করা হোক না কেন, প্রতিটির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিচর্যা, রোগ ও পোকামাকড় দমন করতে হবে। সবজি, ফল, জ্বালানি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ ও সামগ্রী পাওয়ার সাথে সাথে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বসতবাড়িতে বহুস্তর চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট হচ্ছে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ, জীবজন্তুর বিষ্ঠা ও মূত্র, প্রাণিজাত পচনশীল উচ্ছিষ্টাংশ এবং নানা প্রকার আবর্জনা নির্দিষ্ট অনুপাত ও পদ্ধতিতে পচিয়ে তৈরি করা একপ্রকার উন্নতমানের জৈব সার। তুলনামূলকভাবে কম খরচে এই সার তৈরি করা যায়। কম্পোস্টের উপাদানসমূহ হচ্ছে জৈব পদার্থ যা মাটির প্রাণ। উদাহরণস্বরূপ মানুষের জন্য দুধ যেমন একটি আদর্শ খাবার, গাছের জন্য কম্পোস্টও একটি আদর্শ খাবার। জৈব পদার্থের মাধ্যমে মাটিতে অণুজীব টিকিয়ে রেখে মাটির উর্বরতা বাড়াতে কম্পোস্ট সারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কম্পোস্ট সার কেন প্রয়োজন

- মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়।
- মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও বাতাস চলাচল কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়।
- উদ্ভিদ সহজে মূলের বিস্তার করতে পারে ।
- মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- মাটির বিষাক্ততা দূর হয়।
- অণুজীবের কার্যাবলি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় ফলে মাটিতে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদানগুলো সহজলভ্য হয়।
- সবজির গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের সঠিক বৃদ্ধির মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি পায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণির পরিত্যক্ত অংশ, গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি পদার্থ যা পচনশীল।
- প্রতিদিনের গৃহস্থালির আবর্জনা, ডিমের খোসা, ছাই, মাটি।
- ইউরিয়া এবং টিএসপি সার।
- বাঁশের খুঁটি, বাঁশের তৈরি বেড়া ও পলিথিন।
- কোদাল, খন্তা, রশি, ঝুড়ি/টুকরি ইত্যাদি।

কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

- বাড়ির যে স্থানটিতে বর্ষাকালে সাধারণত পানি জমে না এরকম উঁচু স্থান বেছে নিতে হবে। বড় গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থান হলে উত্তম।
- একটি দুই স্তর বিশিষ্ট কম্পোস্ট গর্তের আকার হবে দৈর্ঘ্য ৬ ফুট, প্রস্থ ৩ ফুট এবং গভীরতা ২ ফুট।
- গর্তের চারিদিকে কিছুটা মাটি উঁচু করে বাঁধ বেঁধে দিতে হবে। যাতে গর্তে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- গর্তের মধ্যে কম্পোস্ট উপাদানগুলো নিচের "কম্পোস্ট উপাদান সাজানোর স্তর" নিয়মে সাজাতে হবে।
- সর্বশেষ স্তর তৈরি হয়ে গেলে উপরের অংশে মাটির আস্তর দিয়ে কিছুটা ঢিবির মতো উঁচু করতে হয় যাতে পানি প্রবেশ করতে না পারে।
- কম্পোস্ট গর্তে যাতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে সেজন্য গর্তের মাঝ বরাবর একটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে দিতে হয় যাতে খুঁটি নাড়াচাড়া করলে তার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করতে পারে।
- একটি কম্পোস্ট পিট ঠিকমতো পচতে দেড় থেকে ২ মাস সময় লাগে। ২৫-৩০ দিন পর সবগুলো স্তরকে ওলটপালট করে মিশিয়ে দিতে হয়।
- পচনের পর যখন কম্পোস্ট পদার্থ গাঢ় বাদামি রং ধারণ করবে এবং দেখতে মাটির মতো ভুসভুসে মনে হবে, তখন বুঝতে হবে কম্পোস্ট ব্যবহারের উপযুক্ত হয়েছে।

কম্পোস্ট উপাদান সাজানোর স্তর

- প্রথমেই আবর্জনা, খড়, লতাপাতা, তরিতরকারির উচ্ছিষ্টাংশ, কচুরিপানা প্রভৃতি দিয়ে ৯ ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত ভরাট করতে হবে। কচুরিপানা বেশি লম্বা হলে তা ছোট ছোট করে কেটে ব্যবহার করতে হবে।
- সম্ভব হলে আবর্জনার উপরে ১ মুঠো ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।
- অতঃপর কাঁচা গোবর ২ ইঞ্চি পরিমাণ আবর্জনার উপর বিছিয়ে দিতে হবে।
- এরপর কয়েক মুঠো ডিমের খোসা, শামুক/ঝিনুক চূর্ণ ইত্যাদি ছড়িয়ে দিতে হবে।
- অতঃপর ১ কেজি পরিমাণ ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে।
- সবশেষে বাগানের উপরিস্তরের মাটি দিয়ে ১ ইঞ্চি পরিমাণ আস্তরণ দিতে হবে।
- এভাবে মোট ১ ফুট পরিমাণ এক স্তর বিশিষ্ট কম্পোস্ট সাজানো হয়ে গেল। অনুরূপভাবে পরপর ২-৩ স্তর কম্পোস্ট তৈরি করা যায়।

কম্পোস্ট তৈরিতে লক্ষণীয়

- কম্পোস্টের মধ্যে কোনো অপচনশীল দ্রব্য যেমন-পলিথিন, প্লাস্টিক, কাচ, বাঁশপাতা ইত্যাদি থাকবে না।
- প্রচণ্ড রোদ লাগানো যাবে না এবং লক্ষ রাখতে হবে গাদা যেন অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়। যদি অতিরিক্ত শুকিয়ে যায়, তাহলে ছিদ্রপথে পানি বা গো-চনা ঢেলে গাদাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।
- কম্পোস্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত উপকরণগুলো যেন কোনো সময় পানির সংস্পর্শে না আসে, সংস্পর্শে এলে এর খাদ্য উপাদান দ্রুত কমে যাবে।
- কম্পোস্ট তৈরির উপকরণটি শুকনা হলে কিছু পানি দিতে হবে।

ভালোভাবে পচানোর পর কম্পোস্ট ব্যবহার করতে হবে। তৈরি হবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমিতে ব্যবহার করতে হবে।

ছাদে সবজি, ফল ও ফুল চাষ বা রুফটপ গার্ডেনিং

ছাদের উপর সবজি, ফল ও ফুল চাষ নতুন কিছু নয়। এটি সাধারণ সবজি, ফল ও ফুল চাষেরই প্রতিরূপ যা একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয়। বিশেষ করে শহুরে লোকজন তাদের বাড়ির ছাদে টব, বালতি, ড্রাম বা ট্রেতে সীমিত আকারে যে সবজি, ফল ও ফুলের চাষ করে থাকে তাকেই রুফটপ গার্ডেনিং বলা হয়। বর্তমানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরনের বাগান দেখা যায়। অবশ্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরের ছাদে যেসব বাগান দেখা যায়, তার অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোনো গাছ, এমনকি শাকসবজিও ফলানো সম্ভব। আঙ্গুর, বেদানা, ডালিম, আমড়া, পেঁয়ারা ইত্যাদি নানা ধরনের মৌসুমি ফল ছাড়াও টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলি, লাউ, করলা, শসা, মিষ্টিকুমড়া, শিম ইত্যাদি অনায়াসে উৎপাদন করা যায়।

ছাদ বাগানে শাকসবজি চাষের উদ্দেশ্য

- শহুরে পরিবেশে নিজের বাগানে শাকসবজি ও ফল-ফুল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।
- নির্মল বায়ুপ্রবাহ, পরিবেশের উন্নয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন রোধে সহায়তা করে।
- বাড়ির ছাদ ঠাণ্ডা রাখতে সহায়তা করে।
- শহুরে পাখির আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছাদ বাগানের ধরন

- সবজি বাগান।
- ফল বাগান।
- ফুল, অর্কিড ও শোভাবর্ধনকারী গাছের বাগান।
- ঔষধি গাছের বাগান।

ছাদে বাগান করার জন্য আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয়

- বেশি রোদ বা গরম সহ্য করতে পারে এমন গাছই ছাদে বপন/রোপণ করা উত্তম।
- ছাদে বাগান করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া। কারণ, বাগানের গাছগুলো সাধারণ মাটির সংস্পর্শ হতে দূরে থাকে। তাই নিয়মিত পানি সেচ না দিলে গাছগুলো যে কোনো সময় মারা যেতে পারে।
- ছাদে বাগানের জন্য জৈব সার, গুঁটি ইউরিয়া, খৈল, হাড়ের গুঁড়া (পচিয়ে) ব্যবহার করা ভালো।
- ছোট গাছকে বড় গাছের সামনে রাখতে হবে।
- বছরে একবার নতুন মাটি দিয়ে পুরনো মাটি বদলিয়ে দিতে হবে। এটি অক্টোবর মাসে করলে ভালো।
- জানা দরকার, ছাদের উপযোগী গাছ কোনগুলো। গাছের প্রজাতির ওপর নির্ভর করে যে গাছটি ছাদ বাগানের জন্য তা হাফ ড্রাম, টব নাকি চৌবাচ্চা কাঠামো করে লাগানো হবে এবং এসব গাছের জন্য পরিচর্যার ধরন কী হবে, তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে।
- টবের নিচে ছিদ্র থাকা জরুরি। কয়েকটি ভাঙ্গা চাড়ির টুকরা ছিদ্রের মুখে দিয়ে টবে মাটি ভরতে হবে। তিন ভাগ মাটি, দুই ভাগ গোবর সার, আর এক ভাগ পাতা পচা সার দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে টব পূর্ণ করতে হবে।
- টবে/ ড্রামে গাছের জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হয়। যেমন বড় গাছ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে না দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর দিকে দিতে হবে। এতে আলো, বাতাস এবং রোদ ভালোভাবে পাবে। তাছাড়া ছোট বড় জাতের মিশ্রণ করে সেটিং করলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। আরেকটি জরুরি বিষয় হলো-ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে ফল চাষাবাদে কলমের এবং হাইব্রিড জাতের ব্যবহার বেশি ফলদায়ক।
- কুঁড়ি আসার লক্ষণ প্রকাশ পেলে ৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি একসঙ্গে মিশিয়ে প্রতি গাছে এক চা-চামচ করে ১০ দিন অন্তর দিতে হবে। তবে এক মৌসুমে এই রাসায়নিক সার তিনবারের বেশি দেওয়ার দরকার নেই। রাসায়নিক সার ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সার কোনোক্রমেই শিকড়ের ওপর না পড়ে। সার প্রয়োগের সময় মাটির আর্দ্রতা দেখে নিতে হবে।
- টবের ক্ষেত্রে ছোট গাছ বড় হলে পট/ টব বদল, ডিপটিং (পুরনো টবকে আলতো করে মাটিতে শুইয়ে গড়াগড়ি দিলে গাছটি টব থেকে বেরিয়ে আসবে। পরে অতিরিক্ত মূল কেটে মাটি বদলিয়ে সার প্রয়োগসহ নতুনভাবে গাছ বসানো) করতে হবে সময়মতো। বছরে অন্তত একবার পুরাতন মাটি বদলিয়ে নতুন মাটি জৈব সারসহ দিতে হবে।

- ছাদে চাষের একটা প্রয়োজন হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এজন্য পুরাতন রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে, মানসম্পন্ন ফলন পাওয়া যাবে। ফুল এবং সবজিতে প্রয়োজনমাফিক সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে অন্তত বর্ষার আগে একবার এবং বর্ষার পরে সাবধানে পরিমাণমতো সার দিতে হবে।
- আমাদের দেশের আবহাওয়ায় যে কোনো ফলে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে ২/৩ বার ছাদের বাগান পরিদর্শন করা হলে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কমে যাবে এবং ফসলও ভালো পাওয়া যাবে।

স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী অন্যান্য উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ঘরের ভিতরে, সিঁড়ি, ব্যালকনি, বারান্দা, কার্নিশ এসব জায়গায় অনায়াসে গাছ লাগিয়ে ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ রুফটপ গার্ডেনিং

ছাদে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের সবজির যোগান নিশ্চিত করার জন্য সবজির পঞ্জিকা

কাঠের বাক্স/ট্রে	আগস্ট-অক্টোবর	নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি	মার্চ-জুলাই
কাঠের বাক্স/ট্রে ১	আগাম ফুলকপি	গাজর	ঢেঁড়স
কাঠের বাক্স/ট্রে ২	বেগুন	ব্রোকলি	ডাঁটা
কাঠের বাক্স/ট্রে ৩	লালশাক	ক্যাপসিকাম + লেটুস	করলা
কাঠের বাক্স/ট্রে ৪	মুলা + গাজর	টমেটো	ঝিঙ্গা + ধুন্দুল
কাঠের বাক্স/ট্রে ৫	ধনিয়া	মিষ্টি কুমড়া	পুঁইশাক
কাঠের বাক্স/ট্রে ৬	বিলাতি ধনিয়া + পুদিনা পাতা	শসা + লাউ	কলমীশাক
কাঠের বাক্স/ট্রে ৭	শিম		বরবটি

ছাদে যেসব ফল গাছ লাগানো যায়

আম, পেঁয়ারা, লেবু, বড়ই/ কুল, আমড়া, জামরুল, পেঁপে, মাল্টা, কামরাঙ্গা, ডালিম, কতবেল, তেঁতুল, জাম্বুরা, আঙ্গুর, আতা, শরিফা, সফেদা, জলপাই, লিচু, ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি।

চিত্র: রুফটপ গার্ডেনিং

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ফল পরিচিতি

কাঁঠাল

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল (Jackfruit)। এক প্রকারের হলদে রঙের সুমিষ্ট গ্রীষ্মকালীন ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কাঁঠাল গাছ পরিদৃষ্ট হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Artocarpus heterophyllus*। কাঁচা কাঁঠালকে বলা হয় এঁচোড়। কাঁঠাল গাছের কাঠ আসবাবপত্র তৈরির জন্য অত্যন্ত সমাদৃত। বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা কাঁঠালের

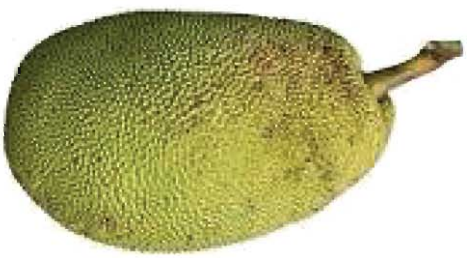

চিত্রঃ কাঁঠাল

উৎপত্তি স্থান হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, বিহার, মিয়ানমার, মালয়, শ্রীলংকা প্রভৃতি এলাকা ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও এরূপ ব্যাপক সংখ্যায় কাঁঠালের চাষ করতে দেখা যায় না। লালচে মাটি ও উঁচু এলাকায় এটি বেশি দেখা যায়। ঢাকার উঁচু অঞ্চল, সাভার, ভালুকা, ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়, বৃহত্তর সিলেট জেলার পাহাড়ি এলাকা, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় সবচেয়ে বেশি কাঁঠাল উৎপন্ন হয়।

কাঁঠালের ব্যবহার

কাঁঠাল পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। এতে আছে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং নায়াসিনসহ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান। কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানবদেহের জন্য বিশেষ উপকারী। কাঁঠাল পটাশিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। এই ফল আঁশযুক্ত হওয়ায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কাঁঠালে রয়েছে খনিজ উপাদান আয়রন যা দেহের রক্তস্বল্পতা দূর করে। কাঁঠাল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। কোষ খাওয়ার পর যে খোসা ও ভুতরো থাকে তা গবাদি পশুর একটি উত্তম খাদ্য। ভুতরো বা ছোবড়ায় যথেষ্ট পরিমাণে পেকটিন থাকায় তা থেকে জেলি তৈরি করা যায়। এমন কি শাঁস বা পাল্প থেকে কাঁচা মধু আহরণ করার কথাও জানা গেছে। কাঁঠাল গাছের পাতা গবাদি পশুর একটি খাদ্য। গাছ থেকে মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরি হয়। ফল ও গাছের আঁঠালো কষ কাঠ বা বিভিন্ন পাত্রের ছিদ্র বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কাঁঠালের জাত

কাঁঠালের বেশ কিছু জাত রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতে চাষকৃত জাতসমূহ মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। গালা ও খাজা - এ দুটি জাত ছাড়াও কাঁঠালের আরো জাত আছে- রুদ্রাক্ষি, সিঙ্গাপুর, সিলোন, বারোমাসী, গোলাপগন্ধা, চম্পাগন্ধা, পদ্মরাজ, হাজারী প্রভৃতি। তন্মধ্যে শুধু হাজারী কাঁঠাল বাংলাদেশে আছে, বাকিগুলো আছে ভারতে।

গালা বা গলা

যখন কাঁঠাল ভালোভাবে পাকে তখন এর অভ্যন্তরে রক্ষিত কোষ অত্যন্ত কোমল ও রসাল প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোষ ছোট। পাকার পর একটু লালচে-হলুদাভ হয়। কোষগুলোকে সহজেই আলাদা করা যায়।

খাজা

কোষ আকারে বড় হয়, পাকার পর কম রসাল ও শক্ত বা কচকচে হয়। কোষ চিপলেও সহজে রস বের হয় না। ফ্যাকাশে হলুদ ও স্বাদ মোটামুটি মিষ্টি হয়।

উচ্চ ফলনশীল জাত

বারি কাঁঠাল-১ এবং বারি কাঁঠাল-২ উচ্চ ফলনশীল এবং সারা দেশে চাষের উপযোগী। মধ্যম সাইজ (৯ কেজি) গাছ প্রতি ১২৫টি ফলসহ ওজন ১১৮০ কেজি পর্যন্ত হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১১৮ টন, ৫৫% খাওয়ার যোগ্য এবং টোটাল সলুবুল সলিডস বাটিএসএস ২২%। বারি কাঁঠাল-২ অমৌসুমি ফল। উফশী জাত, মধ্যম সাইজ (৭ কেজি), গাছ প্রতি ৫৪-৭৯টি ফলসহ ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি হতে পারে। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮-৫৮ টন, খাদ্য উপযোগী ৬০% এবং টিএসএস ২১%।

গাছের বর্ণনা

কাঁঠাল গাছ মাঝারি আকারের এবং প্রায় ৮ মিটার লম্বা হতে পারে। রোপণের সাত বছর পরই ফল ধরা শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে ফুল আসে। সহবাসী উদ্ভিদ বিধায় একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথকভাবে ধরে। কাণ্ডের গোড়ার দিকে সাধারণত স্ত্রী ফুল এবং গোড়া ও শীর্ষে পুরুষ ফুল ধরে। ছোট অবস্থায় পুষ্পমঞ্জরী দেখেই লিঙ্গ নিরূপণ করা যায়। ফুলের মঞ্জরীর উপরিভাগ নরম ও মসৃণ মনে হয়। স্ত্রী মঞ্জরীর উপরিভাগ দানাদানা ও অমসৃণ হয়। স্ত্রী মঞ্জরিদণ্ড মোটা ও খাটো। পুরুষ ফুল সবুজ নলাকার পুষ্পপুট দ্বারা আবদ্ধ একটি পুংকেশর। ডালের গা বেয়ে ফল ধরে। ফল পাকে মে-আগস্ট মৌসুমে।

কাঁঠালের চাষ

পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি সুনিষ্কাষিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী। তবে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ, এঁটেল ও কাঁকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়। বীজ থেকে কাঁঠালের চারা তৈরি করা হয়। ২/৩ মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। গুটি কলম, ডাল কলম, চোখ কলম, চারা কলমের মাধ্যমেও চারা তৈরি করা যায়। ষড়ভুজী পদ্ধতিতে সুস্থ-সবল ও রোগমুক্ত চারা বা কলম মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ মাসে রোপণ করতে হয়। গাছ ও লাইনের দূরত্ব ১২ মিটার । রোপণের সময় প্রতি গর্তে গোবর ৩৫ কেজি, টিএসপি সার ২১০ গ্রাম, এমওপি সার ২১০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার। গুণগত মানসম্পন্ন ভালো ফলন পেতে হলে কাঁঠাল চাষের জমিতে যতটুকু সম্ভব জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ/পানি ব্যবস্থাপনা

চারা/কলমের তাড়াতাড়ি বাড়বাড়তির জন্য পরিমিত ও সময় মতো সেচ প্রদান করা দরকার। চারা লাগানোর সাথে সাথে চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। সকাল-বিকাল দুবার গাছে পানি দিতে হবে। গাছে সার দেওয়ার

পরপর পানি দিতে হবে। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খরার সময় দুই সপ্তাহ পর পর পানি সেচ দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা :

Rhizopus Artocarpi নামের ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের মুচি বা ফল পচা রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামি রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত ফল শেষ পর্যন্ত ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং তা বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল পুড়িয়ে ফেলতে হয়। এ রোগ দমনের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

পরিচর্যা

অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

বাজার সম্ভাবনা

কাঁঠাল খুব উপকারী ফল। কাঁচা কাঁঠাল তরকারি ও পাকা কাঁঠাল ফল হিসেবে খাওয়া যায়। এছাড়া কাঁঠালের বীজ ময়দা ও তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঁঠালের পাতা ছাগলের প্রিয় খাদ্য। কাঁঠালের ছোবড়া গরুর খাদ্য। কাঁঠাল কাঠ দিয়ে উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। কাঁঠাল চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বাড়তি আয় করাও সম্ভব। এছাড়া দেশের চাহিদা মেটানোর পর অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

পেয়ারা

পেয়ারা একটি দ্রুত বর্ধনশীল গ্রীষ্মকালীন ফল। এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। পেয়ারাকে দেশি আপেল বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *Psidium guajava*। ফল মিষ্টস্বাদ ও বীজপূর্ণ।উন্নত জাতের পেয়ারায় বীজের পরিমাণ কম থাকে। পেয়ারা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। এটি অন্য ফসলের চেয়ে অনেক বেশি খরা সহ্য করতে পারে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সুস্বাদু একটি ফল পেয়ারা । দেশি ফলের মধ্যে আমলকীর পরে পেয়ারাতেই সবচেয়ে বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এটি ভিটামিন সি, ক্যারোটিনয়েডস, ফোলেট, পটাশিয়াম, আঁশ এবং ক্যালসিয়াম প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ। পেয়ারার খোসায় কমলায় চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ভিটামিন সি থাকে। পেয়ারাতে প্রচুর পরিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট ও পলিফেনল আছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধক।

চিত্রঃ পেয়ারা

সহজলভ্য এ ফল দেশের প্রায় সব জেলাতেই হয়। তবে বৃহত্তর বরিশালসহ ঢাকার অদূরে নরসিংদী ও গাজীপুরে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারার চাষ করা হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে বরিশাল, পিরোজপুর, স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গাজীপুর, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বি.বাড়িয়া, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়ে থাকে।

জাত

বাংলাদেশের চাষ উপযোগী অনেকগুলো পেয়ারার জাত আছে। সব জাতের পেয়ারাই ছাদে চাষ করা সম্ভব। এর মধ্যে BARI VAR, বাউ পেয়ারা-১ (মিষ্টি), বাউ পেয়ারা-৪, এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৫, বাউ পেয়ারা-৬ এবং থাই পেয়ারা উল্লেযোগ্য । এছাড়াও ইপসা-১ এবং ইপসা-২ পেয়ারাও ভালো জাতের পেয়ারা।
বীজ অথবা গুটিকলমের চারা বর্ষার শুরুতে বসানো যায়। গুটিকলম সবচেয়ে উপযোগী এবং বাংলাদেশে এর বিপুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ১x১x১ হাত গর্তে ১৫ হাত অন্তর রোপণ করতে হয়। দুই তিন বছরেই গাছে ফুল ধরে। বছরে দুই/তিনবার ফুল ধরে। বসন্তের ফুলের ফল পাকে বর্ষায় আর বর্ষার ফুলের ফল পাকে শীতে। শীতের ফলই গুণমানে উৎকৃষ্ট আর বাজারদর ভালো থাকায় চাষিদের কাছে তা বেশ লাভজনক। তাই অনেক সময় চাষিরা বসন্তের ফুলে সেচবন্ধ করে ঝরিয়ে দিয়ে থাকেন। এবং কেবল শীতেই ফলপাকতে দেন। তবে পেয়ারা চাষের প্রধান অন্তরায় এর ডগা শুকানো রোগ। এই রোগ একবার জমিতে এলে একে একে গাছগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে। আক্রান্ত গাছগুলো সম্পূর্ণরূপে তুলে পুড়িয়ে ফেললে তবে পার্শ্ববর্তী গাছগুলোতে এর সংক্রমণ প্রবণতা কমে।

ছাদে বাগান করার জন্য পেয়ারা খুবই উপযোগী, যে কারণে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো:
ছাদে বাগানের জন্য ২০ ইঞ্চি কালার ড্রাম বা টব সংগ্রহ করতে হবে। ড্রামের তলায় ৩-৫টি ছিদ্র করে ছিদ্রগুলো ইটের ছোট ছোট টুকরা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এবার ২ভাগ বেলে দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ গোবর, ৪০-৫০ গ্রাম টিএসপি ও এমওপি সার দিয়ে ড্রাম বা টব ভরে পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে। ১০-১২ দিন এভাবেই রেখে দিতে হবে। যখন ঝুরঝুরে হবে তখন একটি সবল সুস্থ চারা টবে রোপন করতে হবে। চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়া যেন মাটি থেকে আলাদা না হয়ে যায়। চারা গাছটিকে সোজা করা লাগাতে হবে। সেই সঙ্গে গাছের গোড়ায় মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হবে এবং মাটি হাত দিয়ে চেপে চেপে দিতে হবে। যাতে গাছের গোড়া দিয়ে বেশি পানি না ঢুকতে পারে। একটি সোজা কাঠি দিয়ে গাছটিকে বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর লক্ষ রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে। শুকিয়ে গেলে অল্পপরিমাণে পানি দিতে হবে। কখনই বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে স্যাঁত স্যাঁতে অবস্থায় রাখা যাবে না। গ্রীষ্মকালে গাছ যাতে বেশি শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে সে সময় সকাল বিকাল দুই বেলা করে পানি দিতে হবে। বর্ষার ভাব থাকলে অতিরিক্ত পানি না দিলেও চলবে।

গাছ লাগানোর ৪/৫ মাস পর থেকে নিয়মিত ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সরিষার খৈল পচা পানি প্রয়োগ করতে হবে। এ কাজের উপরই ছাদের গাছের ফলন অনেকাংশে নির্ভর করছে। সরিষার খৈল ১০ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই পচা খৈলেরপানি পাতলা করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এক বছর পর টবের আংশিক মাটি পরিবর্তন করে দিতে হবে। ২ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৮ ইঞ্চি গভীরে শিকড়সহ মাটি ফেলে দিয়ে নতুন সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে তা ভরে দিতে হবে। ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর টব বা ড্রামের মাটি কিছুটা খুঁচিয়ে দিতে হবে।

ডাল-পালা ছাঁটাই:

গাছ লাগানোর ২ বছর পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পেয়ারার ডাল কেটে দিতে হবে। ছাদের গাছকে যতটা সম্ভব ছোট রাখতে হবে। ডাল-পালা বড় হলে ফলন কম হবে। গাছকে ছোট রাখলেই ছাদের গাছে অধিক ফলন আশা করা যায়।

ব্যাগিং পদ্ধতিতে পেয়ারা চাষ
পেয়ারা ব্যাগিং করা বা পলি করা বলতে বুঝায় পলিব্যাগ দিয়ে পেয়ারা মুড়ে দেওয়া, যেন-
- মাছি ও পোকা আক্রমণ করতে না পারে
- বাগানে প্রয়োগকৃত বালাইনাশক পেয়ারায় না পড়ে
- অমৌসুমি পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে দ্রুত বড় হয়
- পেয়ারার ত্বকে পাখি/বাদুড়/পোকার বিষ্ঠা/মুখ বা নখের আঁচড় না লাগে

জমিতে পেয়ারা চাষ

বন্যামুক্ত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি পেয়ারা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। জমি কয়েক বার চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হয়।
পেয়ারার চারা বা কলম ৪-৫মি. x ৪-৫ মি. দূরত্বে রোপণ করা হয়। ৬০ x ৬০ x ৬০সে.মি. আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পঁচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে ১৫-২০ দিন পর গর্তের মাঝখানে একটি সুস্থ ও সবল চারা বা কলম রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর পরই চারার গোড়ায় সেচ দিতে হবে এবং একটি খুটি পুঁতে চারাটিকে বেধে দিতে হবে যেন চারাটি হেলে না পড়ে বা বাতাস উপড়ে ফেলতে না পারে।

উপযুক্ত পরিবেশ

সাধারণত: উষ্ণ ও অবউষ্ণ মণ্ডলের জলবায়ু পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উপযোগী। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভালো জন্মে।
বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা খুব সহজ। কিন্তু বীজের গাছে মাতৃ গুণাগুণসম্পন্ন পেয়ারা নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার না করে কলমের দ্বারা বংশ বিস্তার করাই উত্তম। প্রধানত গুটি কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। কিন্তু আজকাল দেখা যায় গুটি কলমে উৎপাদিত চারা উইল্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক হারে বাগান বিলীন হচ্ছে। তাই গুটি কলমের পরিবর্তে উইল্ট প্রতিরোধী জাত যেমন -পলি পেয়ারার রুটস্টকের উপর সংযুক্ত জোড় বা ফাটল জোড় কলমের মাধ্যমে এ পদ্ধতির বংশ বিস্তার করা হয়। মে-জুলাই মাস কলম করার উপযুক্ত সময়।

পরিচর্যা

আশানুরূপ ফলন পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে ১৫ দিন পর পর গাছে সেচ দিতে হবে। তাছাড়া প্রতিবার গাছে সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় প্রয়োজনীয় রস সরবরাহের জন্য সেচ দিতে হবে। এ ছাড়াও বর্ষা কালে পানি নিষ্কাশন ও খরা মৌসুমে নিয়ামিত সেচ প্রদান করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

ক) প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে ১৫-২০ দিন পর গর্তের মাঝখানে একটি সুস্থ ও সবল চারা/ কলম রোপণ করতে হবে ।
খ) চারা রোপণের বছর বর্ষার আগে ও পরে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম করে পটাশ ও টিএসপি সার এবং ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

গ)সার প্রয়োগ : প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে তিন কিস্তিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। বয়স ভেদে গাছের গোড়া ২৫-৫০ সে.মি. বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় গাছ যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে ছায়া প্রদান করে সে পরিমাণ জায়গায় গাছের গোড়া চারদিকে সার প্রয়োগের পর সম্পূর্ণ জায়গা কুপিয়ে উপরোক্ত সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। নিচের ছকে বিভিন্ন বয়সের গাছের সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

সারের নাম	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)
১-২ বছর	১০-১৫	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫০-২০০
৩-৫ বছর	২০-২৫	২৫০-৪০০	২৫০-৪০০	২৫০-৪০০
৬ বা তদূর্ধ্ব বছর	৩০	৫০০-৭৫০	৫০০	৫০০

শাখা ছাঁটাই

শাখা ছাঁটাই বলতে সাধারণত মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করা বুঝায়। বয়স্ক গাছে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল সংগ্রহের পর অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাইয়ের সময় গাছের গোড়াতে গজানো অফসুটসমূহ অবশ্যই ছাঁটাই করতে হবে। অঙ্গ ছাটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ফল ছাঁটাই

পেয়ারা গাছে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ফল আসে। এমনকি একই বোটায় ২-৩ টি পর্যন্ত ফল দেখা যায়। গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব হয় না। ফলের ভারে অনেক সময় গাছের ডালপালা ভেঙে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফলের আকার যখন মার্বেলের মতো হয়, তখন জাত ভেদে ৪০-৬০ ভাগ ফল ছাঁটাই করে দেয়া দরকার। চারা/কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। তবে গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রথম বছর ফল ছেঁটে ফেলাই ভালো, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রেখে বাকি ফল ছেঁটে ফেলে দিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ফসল উৎপাদনে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) অনুসরণ

আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপাদান যেমন, সার, সেচ ও বিভিন্ন কীটনাশকের ব্যবহার হয়ে থাকে এবং প্রায়শ নানাবিধ রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। উৎপাদিত পণ্য পরিবহন, গুদামজাত ও সংরক্ষণের সময়ও নানা প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে কৃষিজাত পণ্য বিশেষ করে ফল ও সবজিকে নিরাপদ রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিরাপদ ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে Good Agricultural Practices (GAP) প্রবর্তন করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও GAP কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষায় GAP কে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) হিসেবে ভাষান্তর করা হয়েছে।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) হলো একগুচ্ছ প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা যা কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। জিএপি অনুসরণে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কাজের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত, পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সহজলভ্য হয়।

উত্তম কৃষি পদ্ধতি চারটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন - (ক) নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন (খ) পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ (গ) জীবনমান ও টেকসই সামাজিক উন্নয়ন এবং (ঘ) নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও কর্মী/শ্রমিক কল্যাণ।

ফসল উৎপাদনের জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফসল ও জাতের গুণাগুণ বিবেচনা করে স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্থান নির্বাচন সঠিক না হলে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া, স্থান নির্বাচনের পূর্বে মাটি ও জলবায়ু, বিদ্যুৎ, পানি প্রাপ্যতা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বাজার সংযোগ, সর্বোপরি শ্রমিকের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য থাকতে হবে।

গাছের উপযুক্ত বৃদ্ধি, ফসলের গুণাগুণ এবং অধিক ফলনশীলতার জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান থাকা জরুরি। উত্তম কৃষি পদ্ধতি (জিএপি) এর ক্ষেত্রে জৈব সারের নিরাপদ ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণভাবে পচে যাওয়া জৈব পদার্থ ব্যবহারের পূর্বে অণুজীবীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা করতে হবে। জমির প্রকারভেদে গাছের বয়স ও মাটির প্রকৃতির উপর ফসলের পুষ্টির চাহিদার তারতম্য হয়। সময় ও মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত এতে অপচয় কম হয় ও অধিক ফলন পাওয়া যায়। শুধুমাত্র অনুমোদিত ও রেজিস্টার্ড সার ব্যবহার করতে হবে যা যে কোনো ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বিশেষ করে হেভি মেটালমুক্ত হতে হবে।

ফসল সংরক্ষণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনায় কাজ না হলে অনুমোদিত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে কীটনাশক

প্রয়োগ করা যাবে। কীটনাশক বিষাক্ত রাসায়নিক যা মাঠ ও ঘরের পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। সঠিক নিয়মনীতি অনুসরণ না করে কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশ বিশেষ করে মাঠকর্মী ও ক্রেতার জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। পোকা ও রোগ সঠিকভাবে শনাক্ত করে সঠিক কীটনাশক নির্বাচন করতে হবে এবং অনুমোদিত মাত্রা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে কীটনাশক ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগকারীকে অবশ্যই এ্যাপ্রোন, মুখোশ, চশমা ইত্যাদি পরিধান করতে হবে। কীটনাশক সবসময় আসল মোড়ক অবস্থায় লেবেলসহ সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে হবে। মজুদ স্থান শুকনা, বায়ু চলাচল উপযোগী ও পানির উৎস এবং মানুষ চলাচলের এলাকা থেকে দূরে রাখতে হবে। কীটনাশক কখনো মানুষ ও পশুখাদ্যের সাথে মজুদ করা যাবে না। কীটনাশক প্রয়োগের অপেক্ষমাণ সময় অতিক্রমের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগের ব্যবহার সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং পাত্রসমূহ পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও গুদামজাতকরণের সময় সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারের উপর মূলত উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্ভর করে। সঠিক পরিপক্বতায় উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করতে হবে। সঠিকভাবে সংগ্রহ করা পণ্য গুন ও মানসম্পন্ন হয়। ফসল সংগ্রহের সময় কীটনাশক প্রয়োগের নির্দেশনা (ফসলে কীটনাশক প্রয়োগের পর সংগ্রহ ও বিষক্রিয়া অতিক্রমের সময়সীমা) কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। সংগ্রহ করা পণ্য প্যাকিং হাউজে প্রেরণ বা পরিবহনের পূর্ব পর্যন্ত ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। জমি থেকে পণ্য সংগ্রহে প্লাস্টিক ক্যারেট ব্যবহার করা উত্তম।

পঞ্চম অধ্যায়
কৃষি উপকরণ

সার

সার কী

ফসল উৎপাদনে বীজ, সার ও সেচ তিনটি মুখ্য কৃষি উপকরণ। তন্মধ্যে সার হলো অন্যতম কৃষি উপকরণ যা ফসল উৎপাদনে ব্যবহার হয়ে থাকে। গাছের খাদ্যই হলো সার। মাটিতে সার প্রয়োগে মাটির পুষ্টি উপাদান যোগ হয় এবং উর্বরতা বাড়ে।

সুষম সার কী

ফসল উৎপাদনে যে পরিমান সার ব্যবহার করার ফলে মাটির পুষ্টি উপাদান ও উর্বরতা বাড়ে, পরিবেশ নষ্ট হয় না, উৎপাদন খরচ কম হয় এবং ফসলের ফলন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাকে সুষম সার বলে।

সারের প্রকার

সার প্রধানত দুই প্রকার। যথা : ১। জৈব সার ও ২। অজৈব সার।
জৈব সার : প্রাণিজ ও উদ্ভিদ থেকে যে সার তৈরি হয় তাকে জৈব সার বলা হয়। যেমন : কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট), গোবর সার ও কম্পোস্ট সার।
অজৈব সার : প্রাণিজ ও উদ্ভিদ ব্যতীত রাসায়নিক উপায়ে যে সার তৈরি হয় তাকে অজৈব সার বলে। অজৈব সারকে সিনথেটিক সার বলা হয়। কল-কারখানা হতে এ সার তৈরি করা হয়। যেমন : ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার।

সারের পরিচিতি

১। সরল সার (Straight Fertilizer): যে সারের মধ্যে উদ্ভিদের প্রধান ৩টি আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান, যথা:- নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের যে কোনো একটি বিদ্যমান রয়েছে এরূপ সারকে সরল সার বলা হয়।
২। যৌগিক সার (Compound Fertilizer) : যে অজৈব সারের মধ্যে কমপক্ষে ২টি আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান থাকে তাকে যৌগিক সার বলে।
৩। মিশ্র সার (Mixed Fertilizer) : বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের সঙ্গে রাসায়নিক অথবা জৈব বস্তুর মিশ্রণ হতে প্রস্তুতকৃত সার।
৪। তরল সার (Liquid Fertilizer): গাছের এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ কোনো দ্রবণে দ্রবীভূত সার। যেমন :
(ক) তরল অজৈব/রাসায়নিক (Chemical) সার
(খ) জৈব তরল (Organic Liquid) সার
(গ) তরল জীবাণু (Liquid Bio Fertilizer) সার

৫। অণুপুষ্টি সার (Micronutrient Fertilizer) : গাছের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদান প্রয়োজন। অল্প পরিমাণে জিংক, বোরন, আয়রন, ম্যাংগানিজ, কপার, মলিবডেনাম ও ক্লোরিন পুষ্টি উপাদান সংবলিত সারকে অণুপুষ্টি সার বলা হয়।

৬। জীবাণু সার (Bio Fertilizer) : জীবাণু ভিত্তিক সার, যা বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা মাটির অদ্রবণীয় ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূতকরণপূর্বক উদ্ভিদে পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যেমন: লিগিউম।

চিত্র:ইউরিয়া সার

চিত্র: টিএসপি সার

চিত্র: এমওপি সার

জৈব সার

(ক) ভার্মিকম্পোষ্ট (Vermicompost)

উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বিভিন্ন প্রকার জৈব বস্তুকে কিছু বিশেষ প্রজাতির কেঁচোর সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগ উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রূপান্তরিত সারকে ভার্মিকম্পোষ্ট বা কেঁচোসার বলা হয়। ভার্মিকম্পোষ্ট সব প্রকার ফসলে যেকোনো সময়ে ব্যবহার করা যায়। সবজি সফলে ৩-৪ মে.টন প্রতি হেক্টরে ও ফল গাছে প্রতি গাছে ৫-১০ কেজি ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহার করা যায়। ফুল বাগানের জন্য ৫০০-৭০০ কেজি প্রতি হেক্টর জমিতে দিতে হবে। জমির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা বজায় রাখার জন্য জৈব সার হিসেবে ভার্মিকম্পোষ্ট ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।

(খ) কচুরিপানা ও কিচেন বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন

মাটির গঠন ও গুনাগুন ঠিক রাখতে হলে জৈব সার ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেক কৃষক জৈব সার তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর সচেতন ও যত্নশীল হলে সামান্য উদ্যোগে নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে অল্প খরচে জৈব সার উৎপাদন করতে পারে। এক্ষেত্রে নিজস্ব শ্রম ও গৃহস্থালি থেকে প্রাপ্ত খড়কুটা, লতা-পাতা, ছাই, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, গোবর, গো-চনা, বাড়ির ঝাড়ু দেওয়া আবর্জনা ও কচুরিপানা ইত্যাদি পচিয়ে বা সংরক্ষণ করে প্রত্যেক কৃষক জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে পারে। তাহলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

জৈব সার/কম্পোস্ট তৈরি

কম্পোস্ট তৈরির জন্য কচুরিপানা ছাড়াও খড়কুটা, ঝরাপাতা, আগাছা, আবর্জনা, ফসলের অবশিষ্টাংশ একত্রে মিশিয়ে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট বা জৈব সার উৎপাদন সম্ভব। বর্ষায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ডোবা-নালাসহ জলাঞ্চলে কচুরিপানায় ভরে ওঠে। যার ফলে তথায় জলাবদ্ধতাসহ পানি দূষিত হয় এবং

মশার উপদ্রব বাড়ে। অথচ এই কচুরিপানাকেই আমরা কম্পোস্টের আসল কাঁচামাল হিসাবে গণ্য করতে পারি। সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরি করা যায় : (১) স্তূপ পদ্ধতি ও (২) গর্ত পদ্ধতি।

(১) স্তূপ পদ্ধতি

অতি বৃষ্টি ও বন্যাযুক্ত এলাকার জন্য স্তূপ বা গাদা পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হবে। বসতবাড়ির আশেপাশে, পুকুর পাড়ে বা ডোবার ধারে কিংবা ক্ষেতের ধারে যেখানে বন্যা কিংবা বৃষ্টির পানি দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই এসব জায়গাকে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরির স্থান হিসাবে নির্বাচন করতে হবে। স্তূপের উপরে চালা দিতে হবে অথবা গাছের নিচে স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন রোদ-বৃষ্টি থেকে কম্পোস্ট সার রক্ষা পায়।

স্তূপের আকার

এ পদ্ধতিতে গাছের ছায়ায় মাটির উপর ৩ মিটার দৈর্ঘ্য, ১.২৫ মিটার প্রস্থ ও ১.২৫ মিটার উঁচু গাদা তৈরি করতে হবে। প্রথমত : কচুরিপানা অথবা অন্যান্য আবর্জনা ফেলে ১৫ সে.মি. স্তুপ তৈরি করতে হবে। স্তর সাজানোর আগে কচুরিপানা টুকরা টুকরা করে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। সাজানো কচুরিপানার স্তরের ওপর ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি সার ছিটিয়ে দেয়ার পর স্তরের উপরিভাগে ২.৫ - ৫.০ সে.মি. পুরু করে কাদা ও গোবরের প্রলেপ দিতে হবে। এতে পচন ক্রিয়ার গতি যেমন বাড়বে অন্যদিকে সুপার কম্পোস্ট তৈরি হবে। এভাবে ১.২৫ মিটার উচু না হওয়া পর্যন্ত ১৫ সে.মি. পুরু স্তরের সাজিয়ে তার উপর ইউরিয়া ও টিএসপি সার দিতে হবে এবং তার ওপর গোবর ও কাদা মাটির প্রলেপ দিতে হবে। গাদা তৈরি শেষ হয়ে গেলে গাদার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

স্তূপ পরীক্ষা

কম্পোস্ট স্তূপ তৈরি করার এক সপ্তাহ পর শক্ত কাঠি গাদার মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে হবে গাদা অতিরিক্ত ভিজা কিনা। যদি ভিজা হয় তবে গাদার উপরিভাগে বিভিন্ন অংশে কাঠি দিয়ে ছিদ্র করে দিতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে পারে। ২-৩ দিন পর গর্ত বা ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। আবার গাদা অতিরিক্ত শুকিয়ে গেলে ছিদ্র করে পানি অথবা গো-চনা ঢেলে দিতে হবে। এতে সার ভালো হবে। কম্পোস্ট তাড়াতাড়ি পচে সার হওয়ার জন্য স্তুপ সাজানোর ১ মাস পর প্রথম বার এবং ২ মাস পর দ্বিতীয় বার গাদার স্তরগুলো উল্টিয়ে দিতে হবে। এ সময় কম পচা আবর্জনাগুলো গাদার মাঝখানে রাখতে হবে। আবর্জনা সার ঠিকমতো পচলে ধূসর বা কালো বর্ণ ধারণ করবে এবং আঙুলে চাপ দিলে যদি গুঁড়া হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে মাঠে সার ব্যবহার উপযোগী হয়েছে। বর্ণিত মাপগুলো যদি ঠিকমতো দেওয়া হয় তবে এ জাতীয় কম্পোস্ট গাদা ৩ মাসের মধ্যে উন্নতমানের সারে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

(২) গর্ত পদ্ধতি

পানি দাঁড়ায় না কিংবা কম বৃষ্টিপাত এলাকা কিংবা শুকনো মৌসুমে গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। গাছের ছায়ার নিচে বাড়ির পেছন দিকে অথবা গোশালার পাশেই কম্পোস্ট গর্ত তৈরি করা সব দিক থেকে সুবিধা জনক।

গর্তের আকারঃ ১.২৫ মিটার প্রস্থ, ১ মিটার গভীর ও ২.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের তলায় বালি অথবা কাঁকর দিয়ে দুরমুজ করে দিতে হবে যেন জলীয় পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে। প্রয়োজনে ধানের খড় বিছিয়ে দেয়া যায়। এছাড়া গোবর কাদার সাথে মিশিয়ে গর্তের তলা এবং চারিপাশে লেপে দিতে হবে। গর্তের ওপর দিকে ভূমি তলা থেকে খানিকটা উঁচু করে আইল তৈরি করে দিতে হবে যাতে কোনো রকম পানি গড়িয়ে গর্তে পড়তে না পারে। এবার গাদা পদ্ধতির মতো করে গর্তে কচুরিপানা স্তরে স্তরে সাজিয়ে কম্পোষ্ট তৈরি করা যায়। অথবা গোয়াল ঘরে গোবর, গো-চনা, পাতা, আখের ছোবড়া, কলাপাতা যাবতীয় উচ্ছিষ্ট অংশ গর্তে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে গো-চনার সাথে কাঠের গুড়া মিশিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। এমনিভাবে এক একটি স্তরের ওপর মাটির প্রলেপ দিতে হবে। মাটির প্রলেপ দেয়ার আগে স্তর যেন ভালোভাবে ঠেসে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গর্ত ভরাট না হওয়া পর্যন্ত এমনিভাবেই স্তর তৈরি করতে হবে। প্রতিটি স্তর তৈরির পর মাটির প্রলেপ দেওয়ার আগে পরিমাণ মতো ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হবে। এরূপ ১টি গর্তে তিন টন আবর্জনার জন্য ১-২ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োজন। গর্ত ভরাট হওয়ার পর গোবর ও মাটি মিশিয়ে উপরিভাগে প্রলেপ দিতে হবে।

গর্ত পরীক্ষাঃ সার যাতে শুকিয়ে না যায় তা পরীক্ষার জন্য গর্তের মাঝখানে ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রের ভিতরে দেখতে হবে যদি শুকনো মনে হয় তবে ছিদ্র দিয়ে পানি অথবা গো-চনা ঢেলে দিতে হবে। জৈব পদার্থে পানির পরিমাণ ৬০-৭০ ভাগ থাকা বাঞ্চনীয়। এ ভাবে তিন মাস রাখার পর এই সার ব্যবহার উপযোগী হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

কৃষক ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্ষেতে বিভিন্ন উপায়ে সার প্রয়োগ করে থাকে। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ না করলে খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের ক্ষতি হতে পারে। কাজেই গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণ ও মাটিকে উর্বর রাখতে হলে মাটি পরীক্ষা করে সঠিক মাত্রায় সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। সুষম সার প্রয়োগে মাটিতে পুষ্টি উপাদান বাড়ে ও মাটি উর্বর হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প জমিতে বেশি ফলন পাওয়ার জন্য অধিক পরিমান রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতির ওপরই প্রয়োগকৃত সারের কার্যকারিতা বাড়ে। সার মাটিতে সরাসরি ব্যবহার এবং ফসলে উপরি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়।

মাটিতে সার ব্যবহারের আগে করণীয়

(১) মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণ আছে তা জানার জন্য মাটি পরীক্ষা করে মাটির গুণাগুণ জানতে হবে।

(২) পরীক্ষিত মাটিতে কোন ফসল চাষ করা যাবে তা জানতে হবে।

(৩) ফসল ভিত্তিক সারের চাহিদা জানতে হবে।

(৪) যে জমিতে ফসল চাষ করা হবে সে জমিতে পূর্বে কী ফসল চাষ করা হয়েছে এবং সে জমিতে কী কী সার ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে হবে।

সার প্রয়োগে সতর্কতাঃ

১) রাসায়নিক সারের মধ্যে ইউরিয়া সার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটা নাইট্রোজেন সারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরিয়া সার মাটিতে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং মৌসুম শেষে মাটিতে তা একবারেই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই ইউরিয়া সার ফসলের চাহিদামাফিক গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির ধাপে ধাপে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

২) ইউরিয়া সার গুটি আকারে ফসলের জমিতে প্রয়োগ করলে ২৫% ইউরিয়া সাশ্রয় হয়।

৩) রাসায়নিক সার যে কোনো বীজ, গাছের গোড়ার কাছাকাছি কিংবা কোনো ভেজা কচিপাতার ওপর ব্যবহার করা যাবে না।

৪) ধান ফসলের কাদাময় জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়, তবে শুকনো জমিতে প্রয়োগের পর নিড়ানি বা আঁচড়া দিয়ে ইউরিয়া সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৫) টিএসপি, এমওপি ও জৈব সার বীজ বপন বা চারা রোপনের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৬) বেলে মাটিতে ইউরিয়া ও এমওপি সার কয়েক বার উপরি প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৭) জমি তৈরির শেষ চাষে পটাশ, গন্ধক ও দস্তা সার প্রাথমিকভাবে একবারে প্রয়োগ করা যায়।

৮) ধান গাছে প্রথম কুশি বের হওয়ার সময়, কাইচ থোড় জন্মের কয়েকদিন আগে এবং গমে মুকুট শিকড় বের হলে, ভুট্টার চারাগাছ যখন হাঁটু সমান উঁচু হয় এবং স্ত্রী ফুল বের হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সার উপরিপ্রয়োগ করা দরকার।

সেচ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উপাদান হলো উন্নতমানের বীজ, সার ও সেচ প্রদান। সেচ ছাড়া উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উৎপাদন করা যায় না। এ দেশে ১৯৬০-৬১ সালে শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল প্রায় মাত্র ৩.৫ লক্ষ হেক্টর। বর্তমানে সেচের আওতায় জমির পরিমাণ বেড়ে প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন : রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাট-বাজার স্থাপন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, নগরায়ণ, শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি, বসতবাড়ি তৈরি ইত্যাদি কারণে কৃষিজমি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই কম জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদনের স্বার্থে ফসলে সেচ প্রদান অপরিহার্য।

সেচ বলতে কী বুঝায়

আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন খাবার গ্রহণ করি। তেমনি জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদিরও খাবার প্রয়োজন হয়। ফসল মাটি হতে খাবার গ্রহণ করে। কিন্তু গাছপালা বা ফসল কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এরা পানির মাধ্যমে তরল খাবার গ্রহণ করে থাকে। সব ফসলের পানির চাহিদা এক নয়। তাই ফসলের ধরন, মাটিতে পানির পর্যাপ্ততা, আবহাওয়া বিবেচনা করে ফসলে কৃত্রিম উপায়ে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই সেচ বলে। অর্থাৎ উদ্ভিদের চাহিদা অনুযায়ী এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পানি মাটিতে সরবরাহ করাকে সেচ বলে।

কখন, কী পরিমাণ সেচ দিতে হয়

সব ফসলে একই পরিমাণ পানি প্রয়োজন হয় না। আবার কোনো কোনো ফসলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দিলে উৎপাদন অনেক বেড়ে যায়। গমে ২/৩ টি সেচ দিলে এর ফলন অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু ধানে অনেক বেশি সেচ দিতে হয়। এজন্য ধানকে পানিপ্রিয় ফসল (Water loving crop) বলা হয়। বর্ষাকালে ফসলে তেমন সেচ দিতে হয় না। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ধানে এর জীবনব্যাপী সেচ প্রদান করতে হয়। বোরো ধানের জীবনকালে ১২০ থেকে ১৪০ সেন্টিমিটার পানি প্রয়োজন হয়। গম ও ভুট্টায় যথাক্রমে ৩০-৪৫ ও ৪০-৫০ সেন্টিমিটার সেচ প্রদান করতে হয়।

সেচের পানির উৎস

পৃথিবী পৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগই পানি– এ কথা আমরা সবাই জানি। এর পরেও খাদ্য উৎপাদনে এই পানি সুলভ নয়। পৃথিবীতে যে পরিমাণ পানি আছে তার প্রায় ৯৮% সমুদ্রে এবং প্রায় ২% বরফ আকারে মেরু অঞ্চলে ও পর্বতপৃষ্ঠে। পৃথিবীর মোট পানির তুলনায় খুব সামান্য অংশই

গৃহস্থালি ও কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। সেচের পানির পানির উৎস ২টি যথা :

(১) ভূপৃষ্ঠস্থ পানি
(২) ভূগর্ভস্থ পানি।

আমাদের দেশে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির দ্বারা মোট সেচের মাত্র ২২% এবং ভূগর্ভস্থ পানির দ্বারা ৭৮% সেচ প্রদান করা হয়।

সেচের পদ্ধতিসমূহ

পানির উৎস থেকে পানি উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। (ক) সনাতন পদ্ধতি, যেমন : দোন, সেউতি ইত্যাদি; (খ) আধুনিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির আওতায় ফসলি জমিতে পানি সরবরাহ করার জন্য মনুষ্য শক্তির মাধ্যমে হস্তচালিত সেচযন্ত্র, ট্রেডলপাম্প, রোয়ারপাম্প ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এসব পাম্প দ্বারা খুব কম পানি উত্তোলন করা যায় বলে বেশি জমি এসব পাম্প দ্বারা সেচের আওতায় আনা যায় না। যান্ত্রিক সেচযন্ত্র ব্যবহার করে ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভস্থ বেশি পরিমাণ পানি উত্তোলন করা যায়। ভূপৃষ্ঠের পানি উত্তোলনের জন্য লো-লিফট পাম্প বা শক্তি চালিত সেচযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য গভীর ও অগভীর সেচযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফসলি জমিতে সেচ প্রদান বা পানি সরবরাহের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফসলের ধরন, ফসলে পানির চাহিদা, মাটির ধরন, ভূমির বন্ধুরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচ পদ্ধতিকে প্রধানত ৩ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) প্লাবন পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে সমতল ভূমিতে সেচ প্রদান করা হয়। বন্যার মতো ফসলি জমিতে পানি ভাসিয়ে দিয়ে সেচ দেওয়া হয় বলে একে প্লাবন পদ্ধতি বলে। ধানের জমিতে প্লাবন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: ধান ক্ষেতে প্লাবন পদ্ধতিতে চাষ

খ) স্প্রিংকলার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাইপ ও স্প্রিংকলার নজেলের মাধ্যমে জমিতে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বৃষ্টির মতো পানি জমিতে পড়তে থাকে। যেসব ফসলে কম পানি প্রয়োজন হয় অথবা বেলে মাটিতে এই সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গম ফসলে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরি।

চিত্র: স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ উৎপাদন

গ) ড্রিপ পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে বড় পাইপ থেকে ছোট ছোট ব্যাসযুক্ত পাইপের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়। ছোট পাইপ হতে গাছের গোড়ায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেওয়া হয়। ফল বাগানে বা মূল্যবান ফসলে এ ধরনের সেচ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি উৎপাদন

কলস সেচ

আমরা জানি আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৮টি জেলার প্রায় ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার হেক্টর জমির মাটি বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত। কলস সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

'কলস সেচ (Pitcher Irrigation)' প্রযুক্তির উদ্দেশ্য :

- মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে ফসল চাষ।
- অল্প পরিমাণে সেচের পানি ব্যবহার করে মাদা ফসল (কুমড়া, তরমুজ, উচ্ছে, ঝিংগা ইত্যাদি) উৎপাদন।
- সেচের পানির অপচয় রোধ ও সুষম ব্যবহার।
- উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান গ্রহণে মাটিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

'কলস সেচ (Pitcher Irrigation)' প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ :

- কলস সেচ প্রযুক্তি মাদা ফসল যেমন : কুমড়া, তরমুজ, উচ্ছে, ঝিংগা ইত্যাদির জন্য উপযোগী।
- যেসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত উৎস থাকে না
- যেসব এলাকায় পানি সেচের জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা যায়।

'কলস সেচ (Pitcher Irrigation)' প্রযুক্তির কার্যপ্রণালি :

- একটি সাধারণ আকারের মাটির কলস সংগ্রহ করতে হবে।
- কলসের নিচে ড্রিল মেশিন দ্বারা বল পয়েন্ট কলমের আকারে (পরিধি আনুমানিক ২.২ সেমি) ছিদ্র করতে হবে এবং ঐ ছিদ্রে দেড়-দুই হাত লম্বা পাটের এক প্রান্ত শক্ত করে প্রবেশ করাতে হবে।
- পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্রগুলো ও পাটের আঁশ মাটির নিচে থাকে।
- কলসের চারপাশে ৩-৪টি বীজ বপন করতে হবে। তাহলে কলসের চারপাশে চারা গজাবে।

➢ কলসের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত পাট ধীরে ধীরে পানি বহন করে নিয়ে গাছের গোড়ায় সরবরাহ করবে। এতে মাদা সবসময় ভিজে থাকবে। ফলে মাটির নিচ স্তর থেকে মাদা এলাকায় (গাছের শিকড় সংলগ্ন এলাকায়) লবণযুক্ত পানি উঠে আসবে না এবং এর ফলে মাদা এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ কম থাকবে। সেই সাথে গাছ পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য উপাদান আহরণ করতে পারবে এবং গাছ সতেজ থাকবে।

একটি সাধারণ আকারের মাটির কলস

কলসের নিচে ছিদ্র করে ছিদ্রে দেড় - দুই হাত লম্বা পাটের এক প্রান্ত শক্ত করে প্রবেশ করানো হয়েছে

পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে বসানোর পর বীজ বপন করা হচ্ছে।

পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে এমনভাবে বসানো হয়েছে এতে ছিদ্রগুলো ও পাটের আঁশ মাটির নিচে রয়েছে।

অর্থনৈতিক হিসাব (ফসল-কুমড়া, জাত-সুইটি)

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে কলস পদ্ধতিতে সেচকৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ৩০ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদাপ্রতি বিক্রয় মূল্য ২৪০ টাকা।

কলস, সার, কীটনাশক, পানি ও শ্রমিক খরচ মাদা প্রতি ১২৫ টাকা। অতএব মাদাপ্রতি লাভ (২৪০-১২৫) = ১১৫ টাকা। অন্যদিকে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে সেচকৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ১৮ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদাপ্রতি বিক্রয়মূল্য ১৪৪ টাকা। সার, কীটনাশক, পানি ও শ্রমিক খরচ ৯৫ টাকা। এ ক্ষেত্রে মাদাপ্রতি লাভ (১৪৪-৯৫) = ৪৯ টাকা।

এছাড়া একটি কলস সাবধানে ব্যবহার করলে কমপক্ষে দুই বছর ব্যবহার করা সম্ভব। এ ধরনের সহজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ত এলাকার কৃষি উৎপাদনে এবং গ্রামীণ জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন সম্ভব।

মাদায় গাছ সতেজ হয়ে উঠছে

ক্রমে সমগ্র খামার ফসলে ভরে উঠছে

ষষ্ঠ অধ্যায়
কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কী?

কৃষির বিভিন্ন স্তর যেমন চাষ, বীজ বপন, রোপণ, সার প্রয়োগ, মধ্যবর্তী সময়ের পরিচর্যা, কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও গুদামজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামের ব্যবহার প্রক্রিয়াকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বুঝায়। এক কথায়, পশু বা শ্রমশক্তির পরিবর্তে কৃষি কাজে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি কাজকে বেগবান করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই হলো কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব

দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে কৃষি জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। শিল্পায়ন, গৃহায়ন ও অন্যান্য কারণে ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া জমি থেকে অধিক ফসল প্রাপ্তির লক্ষ্যে সময়মতো চাষ, কৃষি ফসলের উপকরণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষি কাজের সকল স্তরে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

কৃষি কাজে ব্যবহৃত শক্তি-যা মূলত

পশু শক্তি, শ্রম শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে চাষের কাজে ব্যবহৃত পশুর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। আবার কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের একটি বড় অংশ শিল্প, পরিবহন ও অন্যান্য খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে বিধায় শ্রমিকের অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে যান্ত্রিক উৎস থেকে কৃষি শক্তির ঘাটতি পূরণই একমাত্র উপায়। কৃষি কাজকে ব্যয় সাশ্রয়ী তথা দেশে লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে জমিতে সময়মতো চাষ, রোপণ ও কর্তন করার স্বার্থে কর্ষণ যন্ত্র, রোপণ যন্ত্র, শস্য কর্তন যন্ত্র (রিপার, কম্বাইন হারভেস্টার), শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র সহজলভ্য করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি

দেশে বিদেশে উদ্ভাবিত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এ দেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। নতুন উদ্ভাবিত এবং আমদানিকৃত প্রধান প্রধান আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(ক) বহুল ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি

পাওয়ার টিলার

- সর্বাধিক ব্যবহৃত জমি চাষ করার যন্ত্র।
- সময় কম লাগে।
- ঘণ্টায় ১-১.৫ বিঘা জমি চাষ করা যায়।

চিত্র : পাওয়ার টিলার

ট্রাক্টর

- ট্রাক্টরের সাহায্যে দ্রুত গতিতে ও স্বল্প শ্রমে জমি ভালোভাবে চাষ করা যায়।
- পাওয়ার টিলারের তুলনায় চাষ গভীর হয় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী।
- ঘণ্টায় ১ (এক) একর জমি চাষ করা যায়।

চিত্র : ট্রাক্টর

মাড়াই যন্ত্র

(ক) ওপেন ড্রাম

(খ) ক্লোজড ড্রাম

- এ ধরনের যন্ত্র দিয়ে ধান, গম ও ডাল শস্য মাড়াই করা যায়।
- ১২ অশ্ব শক্তিসম্পন্ন এ রকম যন্ত্র দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ধান ৯৩০ কেজি এবং গম ৩৪০ কেজি মাড়াই করা যায়। কম আর্দ্রতা সম্পন্ন ফসল মাড়াইয়ে ব্যবহার করলে যন্ত্রটির মাড়াই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র : ওপেন ড্রাম

চিত্র : ক্লোজড ড্রাম

(খ) নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্র

রিপার/ শস্য কর্তন যন্ত্র

- যন্ত্রটি দিয়ে ধান ও গম কাটা যায়।
- কিছুটা হেলে পড়া ধান বা গমও কাটা যায়।
- কাটা ধান বা গম ডান পাশে সারিবদ্ধভাবে পড়ে যাতে সহজে আঁটি বাধা যায়।
- প্রতি ঘণ্টায় জ্বালানি খরচ মাত্র ০.৮ লিটার পেট্রোল।
- প্রতি ঘণ্টায় ধান ৩৫-৫০ শতাংশ এবং গম ৪৫-৬০ শতাংশ কাটা যায়।

চিত্র : রিপার যন্ত্র

রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার

- এ যন্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে ধানের চারা লাগানো যায়। বীজতলার জন্য আলাদা জমির দরকার নেই। বাড়ির উঠানেও বীজতলা তৈরি করা যায়।
- বিভিন্ন দূরত্বে ও গভীরতায় চারা রোপণ করা যায়।
- রোপণ যন্ত্র একটি আধুনিক; সময় ও সাশ্রয়ী যন্ত্র।
- জ্বালানি খরচ ঘণ্টায় মাত্র ০.৫-০.৬ লিটার অকটেন/ পেট্রোল লাগে।
- প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৪০ শতাংশ জমিতে চারা লাগানো যায়।
- ৫৮×২৭.৮ বর্গ সেন্টিমিটার সাইজের ট্রেতে চারা তৈরি করতে হয়।

চিত্র :রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র

কম্বাইন হারভেস্টার

- এ যন্ত্র দিয়ে ধান এবং গম কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তায় ভরা একই সাথে করা যায়।
- এ যন্ত্র দ্বারা কম খরচ, স্বল্প শ্রম ও সময়ে ধান/গম কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই করা যায়।
- মাঝারি ধরনের কম্বাইন হারভেস্টারের কার্যক্ষমতা প্রায় এক একর।
- যন্ত্রটি অল্প পানি ও কর্দমাক্ত জমিতে চলতে পারে।

চিত্র : কম্বাইন হারভেস্টার

বীজ বপন যন্ত্র

- এ যন্ত্র দিয়ে ধান, গম, ভূট্টা, পাট, তৈল বীজ ও ডাল জাতীয় শস্য সারিতে বপন করা যায়।
- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- এ যন্ত্রটি নির্দিষ্ট স্থানে ও সঠিক গভীরতায় সুষমভাবে বীজ বপন করে।
- ঘন্টায় ৩৭-৫০ শতাংশ জমিতে বপন করা যায়।

চিত্র : বীজ বপন যন্ত্র

বেড প্লান্টার :

চিত্র : বেড প্লান্টার

- এ যন্ত্র দিয়ে গম, ভুট্টা, আলু, মুগ, তিলসহ বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ বেড নালা তৈরি করে বপন করা যায়।
- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- বেড তৈরি, সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ একই সঙ্গে করা যায়। ঘণ্টায় ২৫-২৭ শতাংশ জমিতে বপন করা যায়।

গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

চিত্র : গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ

- এ যন্ত্র দ্বারা ধানের জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে সময় কম লাগে।
- ঘন্টায় প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়।
- কায়িক শ্রম কম লাগে।

টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- দক্ষ চালক এবং মেকানিক তৈরি করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে ওয়ার্কশপ সুবিধা থাকা।
- লাগসই কৃষি যন্ত্র প্রস্তুত/আমদানি করা।
- গ্রামীণ পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ।
- দেশে তৈরি /আমদানিকৃত যন্ত্রের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড

মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নিকট আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদা সৃষ্টি ও জনপ্রিয়করণে কৃষি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রদর্শনী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্র কৃষকদের নিকট পরিচিতিকরণ, ৩০% উন্নয়ন

সহায়তার (ভর্তুকি) মাধ্যমে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মাঝে সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য দক্ষ চালক ও মেকানিক তৈরি করাসহ নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নব নব কৃষি যন্ত্রপাতি এ দেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা রেখে আসছে। পাশাপাশি বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারক কৃষি যন্ত্র সহজলভ্য করে দেশের যান্ত্রিকীকরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেন।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের কৃষি কাজে কৃষি শ্রমিকের স্বল্পতা, কৃষি জমি কমে যাওয়ার মতো প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, আকস্মিক বন্যার মতো ঝুঁকি থেকে কৃষিকে রক্ষা করার জন্য অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সাম্প্রতিক সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বিশেষ করে শস্য উৎপাদন পরবর্তী অপচয়, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কৃষকের প্রচেষ্টা এবং সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে অচিরেই বাংলাদেশে যান্ত্রিকীকরণ টেকসই রূপ লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

পুকুরে পাঙ্গাশ মাছ চাষের উন্নত কলাকৌশল

বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপকভাবে চাষকৃত মাছের মধ্যে মেকং ডেলটার পাঙ্গাশ একটি উন্নত প্রজাতি। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুরে ৮ মে ১৯৯০ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সর্ব প্রথম থাই পাঙ্গাশের পোনা উৎপাদন ও পরবর্তীতে পুকুরে চাষ শুরু হয়। এরপর মৎস্য অধিদপ্তরসহ বেসরকারি উদ্যোগে পাঙ্গাস চাষ প্রযুক্তি সারাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং তা দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে দেশে পাঙ্গাশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৬০ হাজার মে. টন।

পাঙ্গাশ মাছের বৈশিষ্ট্য

- সুস্বাদু ও কম কাঁটাযুক্ত মাছ
- অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় এবং দৈহিক বৃদ্ধির হার রুই জাতীয় মাছের চেয়ে বেশি বলে এদের উৎপাদন অনেক বেশি যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।
- প্রতিকূল পরিবেশে (কম অক্সিজেন, পিএইচ, পানির ঘোলাত্বের তারতম্য ইত্যাদি) পাঙ্গাশ মাছ বাঁচতে পারে।
- রাক্ষুসে মাছ নয় বিধায় রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায় এবং সর্বভুক বিধায় সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে চাষ করা যায়।
- স্বল্প থেকে মধ্যম লবণাক্ত পানি (২-১০ পিপিটি), ঘের ও খাঁচা এবং অন্যান্য মৌসুমে জলাশয়ে পাঙ্গাশ মাছ চাষ করা যায়।

পাঙ্গাশ মাছ চাষ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি

পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হলো পুকুরে মাছের সহনীয় বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা। ৫০-১০০ শতাংশ আয়তন বিশিষ্ট ও ২-৩ মিটার পানির গভীরতা সম্পন্ন পুকুর পাঙ্গাশ চাষের জন্য উত্তম। পুকুর প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা যায় :

- আগাছা দূরীকরণ, পুকুর পাড় মেরামত ও পুকুরের তলায় অধিক কাদা জমলে বা তলা ভরাট হয়ে থাকলে তলার অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। পুকুর শুকানোর পর ভাঙ্গা পাড় ও অসমতল তলা মেরামত করতে হবে।
- রাক্ষুসে মাছ ও আগাছা দূরীকরণ : পুকুরে রাক্ষুসে মাছ ও আগাছা থাকলে পাঙ্গাশ চাষে কাঙ্ক্ষিত সফলতা বিঘ্নিত হয়। তাই পুকুর সেচে বা বিষ প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ও আগাছা অপসারণ করতে হবে। রোটেনন প্রতি শতাংশে (৩০ সে.মি. পাঁনির গভীরতার) ২৫-৩০ গ্রাম প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- চুন প্রয়োগ- মাটি ও পানির অবস্থাভেদে চুন প্রয়োগের মাত্রার তারতম্য ঘটতে পারে। পানির পিএইচ ৮.৫ এর নিচে হলে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৭ অথবা ১৫ দিন পর প্ল্যাংকটন উৎপাদনের জন্য পুকুরে জৈব ও অজৈব সার ব্যবহার করতে হবে। জৈব সার হিসেবে গোবর, কম্পোস্ট এবং অজৈব সার হিসেবে ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, ব্যবহার করা যেতে পারে। পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রতি শতাংশে ১০০-১৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২৫-৩০ গ্রাম এম.পি মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। অজৈব সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর পানির রং সবুজ বা বাদামি হলেই পুকুরে পোনা মজুদ করতে হবে।

পোনা মজুদ ও চাষাবাদ পদ্ধতি

পাঙ্গাশ সাধারণত এককভাবে অথবা মিশ্রভাবে চাষ করা যেতে পারে। পুকুরের নিচের স্তরের খাবার খায় এমন প্রজাতির মাছ যেমন- মৃগেল, কালিবাউস মজুদ না করাই উত্তম বা সংখ্যায় খুবই কম পরিমাণে মজুদ করতে হবে। পুকুরে পানির গভীরতা ২-৩ মিটার হলে একক চাষে প্রতি শতাংশে ৮-১০ সে.মি. আকারের ১৫০-২০০টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। মিশ্র চাষের বেলায় প্রতি শতাংশে ৬০-৭০টি পাঙ্গাশের পোনার সাথে ৮-১০টি রুই, ১২-১৫টি সিলভার কার্প ও ৩০-৩৫টি মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা মজুদ করলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য গুণাবলি পরীক্ষা করা উচিত। পানির তাপমাত্রা ও অন্যান্য গুণাবলির সাথে কমপক্ষে ৩০ মিনিট খাপ খাইয়ে পোনাকে ধীরে ধীরে পুকুরে ছাড়তে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ ও মাত্রা

পাঙ্গাশ চাষে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক খাদ্যের উপর নির্ভর করা চলবে না। পরিকল্পিতভাবে পাঙ্গাশ চাষ করতে হলে মাছকে অবশ্যই চাহিদামতো সুষম দানাদার খাদ্য দিতে হবে। খাদ্য প্রয়োগের উপরই পাঙ্গাসের বৃদ্ধির হার প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

পাঙ্গাসের খাদ্যে ২৫-৩২% প্রাণিজ আমিষ থাকতে হবে। ফিশমিল বা শুঁটকি মাছের গুঁড়া, গবাদি পশুর রক্ত, ইত্যাদির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ আছে। মিশ্রিত খাদ্যকে পেস্ট বা মণ্ড বানিয়ে বল করে সরাসরি পুকুরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন মৎস্য খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমানের আনুষাঙ্গিক বিশ্লেষণ

পাঙ্গাশের পুকুরে প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে মাছের দেহের ওজনের উপর। এ ক্ষেত্রে মাছের গড় ওজনকে হিসেবে এনে প্রতি ১৫ দিন অন্তর নমুনায়নের মাধ্যমে পুকরের মাছের গড় ওজন বের করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। মোট মাছের ওজন বা

খাদ্য উৎপাদন	শতকরা হার (%)	আমিষের পরিমাণ (%)	তৈরি খাদ্যে আমিষের পরিমাণ (%)
মৎস্য চূর্ণ	২০	৫৬	১১.২
সরিষার খৈল	১৫	৩০	৪.৫
গমের ভূষি	২০	১৫	৩.০
চাউলের কুঁড়া	২০	১২	২.৪
মিট এন্ড	১০	৫৫	৫.৫
বোন মিল			
সয়াবিন মিল	১৫	৩০	৪.৫
মোট	১০০		৩১.১

জীবভরের (Biomass) ১৮-৩% হারে খাবার দিতে হবে। প্রতিদিন দু'দফা সকাল ও বিকেলে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে হবে। দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণকে ২ ভাগে ভাগ করে সকালে ৫০% এবং বিকালে ৫০% দিতে হবে। দানাদার খাদ্য ছিটিয়ে এবং ভিজা খাদ্য বল বানিয়ে দিতে হবে। খাদ্যগুলো পুকুরের আয়তন অনুসারে ৪-৬ স্থানে দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া পুকুর অত্যাধিক গভীর হলে ট্রে বা খাবারদানি তৈরি করে তাতে খাদ্য দিলে খাদ্যের অপচয় কম হয়।

আহরণ ও উৎপাদন

উল্লিখিত পদ্ধতিতে চাষ করলে পাঙ্গাশ মাছ ১ বছরে গড়ে ১.৫-২.০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। পাশাপাশি মজুদকৃত অন্যান্য মাছও বাজারজাত উপযোগী হয়। এতে বছরে ২৫-৩০ টন / হে. মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

পাঙ্গাশ চাষে সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত সমস্যা

- মৎস্য খাদ্যের পুষ্টিমান হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন হ্রাস।
- খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি।
- অধিক ঘনত্বে মজুদ ও অতিরিক্ত খাদ্য ব্যবহারের কারণে পানি দূষিত হয়ে মাছে রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি।

সমস্যার কারণ

- অধিক ঘনত্বে (শতাংশে ৩০০-৪০০টি) পোনা মজুদ ও অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ।
- পাঙ্গাশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক খাদ্যে প্রয়োজনীয় মাত্রার (২৫-৩২%) চেয়ে অনেক কম মাত্রার নিম্নমানের প্রোটিনযুক্ত (১৫-২০%) ভেজাল খাদ্য ব্যবহারের কারণে খাদ্যের কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া।
- প্রানিজ খাদ্য উপাদান যথা ফিশমিল এবং গুণগতমানসম্পন্ন মিট ও বোন মিলের অভাব ও মূল্য বৃদ্ধি।

- অতিমাত্রায় খাদ্য প্রয়োগের ফলে পানির গুণাগুণ বিনষ্ট ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া। অব্যবহৃত খাদ্য, মাছের জৈবিক বর্জ্য ও তলদেশে সঞ্চিত কাদা ইত্যাদি পচনের ফলে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি এবং অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের বিষাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া
- অন্তঃপ্রজনন সমস্যাযুক্ত ও নিম্নমানের পোনা ব্যবহারের কারণে উৎপাদনশীলতা হ্রাস।

সমস্যা সমধানের করণীয়

- সুপারিশকৃত ঘনত্বের চেয়ে অধিক হারে পোনা মজুদ পরিহার করতে হবে। পাঙ্গাশের একক চাষে ১০-১৫ সে.মি. আকারের পাঙ্গাশের পোনা প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০টি মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের সময় যথাসম্ভব একই আকারের পোনা মজুদ করলে সামগ্রিক উৎপাদন ভালো হবে।
- রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষে প্রতি শতাংশ ৬০-৭০টি পাঙ্গাশ, ৮-১০টি রুই, ১২-১৫টি সিলভার কার্প ও ৩০-৩৫টি মনোসেক্স তেলাপিয়া মজুদ করলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করতে হবে এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ২৫-৩২% বজায় রাখতে হবে। মজুদকৃত মাছের বয়স ও দৈহিক ওজনের অনুপাতে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। অতিমাত্রায় খাদ্য ব্যবহার অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সরবরাহকৃত খাদ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে নতুবা অব্যবহৃত খাবার পুকুরের তলায় জমে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করবে এবং হঠাৎ করে মাছের মড়ক লাগতে পারে।
- পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রতি মাসে সঠিক মাত্রায় চুন/জিওলাইট ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় সময়ে পানি সরবরাহ ও অতিরিক্ত পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সাধারণ নিয়মাবলি যথা- উন্নত চাষ ও খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব অথবা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- মাছের স্বাদ ও বাজার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বিক্রির ২ দিন পূর্বে বিক্রয়যোগ্য মাছ পরিষ্কার পুকুরে স্থানান্তর করে প্রবাহমান পানিতে রেখে বাজারজাত করতে হবে। ঐ সময় খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে।
- পাঙ্গাশের বাজার চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ যথা- ফিলেট, স্টিক/স্লাইস মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন

গবাদি পশুর রোগব্যাধি

দুধ, মাংস ও ডিম দ্বারা প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানো, চাষাবাদ, জৈবসার এবং জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যে আবহমান কাল থেকে মানুষ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি পালন করে আসছে। বর্তমানে হাঁস-মুরগি এবং গবাদিপশু শিল্পের প্রসার ঘটার ফলে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও উৎপাদনে নারীর সম্পৃক্তকরণের উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে প্রাণিসম্পদ।

গরু পালন

আমাদের দেশে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গরুই প্রধান। দুধ ও মাংসের জন্য গরু পালন করা হয়। এদেশের গ্রাম অঞ্চলে গরু পালনের পাশাপাশি বর্তমান শহরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামারে গরু পালন করা হচ্ছে।

গরুর জাত

বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণত ৩ জাতের গরু দেখা যায় যথা :

১. দেশি জাতের গরু : দেশি জাতের গরুর মধ্যে পাবনা, রেড চিটাগাং (আরসিসি), মুন্সিগঞ্জ, নর্থ বেঙ্গল গ্রে গরু অন্যতম। এরা ২-৫ লিটার দুধ দিয়ে থাকে।

২. উন্নত বিদেশি জাতের গরু : দুধালো জাতের মধ্যে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি এবং মাংসল জাতের গরুর মধ্যে ব্রাহমান, বিফ মাস্টার, রেড অ্যাংগাস, ইত্যাদি । এরা প্রতিদিন প্রায় ১৫-৪০ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদন করে।

৩. সংকর জাতের গরু : অধিক উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে আমাদের দেশি জাতের গরুর সাথে উন্নত জাতের গরুর সাথে সংকরায়ন করা হয়। এগুলোকে সংকর জাতের গরু বলে। এদের উৎপাদন দক্ষতা দেশি গরুর তুলনায় অধিক।

গরুর খাদ্য ও পুষ্টি

গরুকে আঁশ এবং দানাদার জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে তাদের পুষ্টি সরবরাহ করা হয়। তবে আঁশ জাতীয় খাদ্য হিসেবে খড় ও কাঁচা ঘাস এবং দানাদার জাতীয় খাদ্য হিসেবে গম, ভুষি, খৈল, কুঁড়া, খনিজ মিশ্রণ, লবণ সরবরাহ করা হয়। কাঁচা ঘাস হিসেবে উন্নত জাতের ঘাস যেমন - নেপিয়ার, পারা, জার্মান, ভুট্টা সরবরাহ করা হয়।

ছবি : গরু পালন

বাসস্থান : এদেশে গ্রাম অঞ্চলে চালাঘরে গরু রাখা হয়। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গরু পালন করলে বহিঃমুখী ও অন্তঃমুখী বাঁধা ঘর তৈরি করা হয়।

রোগ বালাই : এনথ্রাক্স, ক্ষুরারোগ, ওলান পাকা রোগ, বাদলা, গলাফুলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে।

ছাগল পালন

ছাগল আকারে ছোট, কম খাদ্য খায়, বছরে কমপক্ষে দুই বার চারটি বাচ্চা দেয়, কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, ছাগলের মাংস অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু, সেদিক বিবেচনায় ছাগলকে "গরিবের গাভী" বলা হয়। বাংলাদেশে বহুল পরিচিত এবং পালিত ২টি ছাগলের জাত হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং যমুনাপারি।

চিত্র : ছাগল পালন

বাসস্থান : ছাগল ছেড়ে, অর্ধ ছেড়ে এবং আবদ্ধ অবস্থায় (স্টল ফিডিং) পালন করা যায়। ছাগলের পালনে ২ ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো ১. ভূমির উপর ঘর ২. মাচার উপর ঘর।

খাদ্য : ছাগল তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে, মোট খাবারের ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুঁড়া, ভুষি, চাল, ডাল)। ছাগলের বয়সের এবং উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন খাবার সরবরাহ করা হয় সেগুলো হলো বাচ্চা অবস্থায় খাদ্য, বাড়ন্ত অবস্থায় খাদ্য, প্রজননক্ষম ছাগল ও পাঁঠার খাদ্য, গর্ভবতী অবস্থায় খাদ্য।

রোগ বালাই : ছাগলে অন্যতম রোগ সমূহ হচ্ছে পিপিআর, পোটাপক্স, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

ভেড়া পালন

দেশের সব এলাকায় কমবেশি ভেড়া পালন করা হয়। তবে সমুদ্র উপকূল, রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকা ও পাহাড়ি এলাকায় ভেড়া বেশি পালন করা হয়। ভেড়া থেকে মাংস, দুধ ও পশম পাওয়া যায়। ভেড়া পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে চলতে পারে। কয়েকটি উন্নত জাতের ভেড়া হলো মেরিনো, ডরসেট, ডামারা, সাফোক, র‍্যামবুলেট ইত্যাদি।

বাসস্থান: ভেড়ার ঘর খড়, ছন, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। ভেড়া বাঁশ বা কাঠের মাচায় রাখলে রোগবালাই কম হয়।

খাদ্য ও পুষ্টি : ভেড়া মাটিতে চড়ে খেতে পছন্দ করে। এরা ঘাস, লতাপাতা, সাইলেজ, হে, খড়, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেয়ে থাকে। খাদ্যভাবের সময় এরা মোলাসেস মিশ্রিত খড়, নাড়া ইত্যাদিও খায়।

ছবিঃ ভেড়া পালন

রোগ বালাই : সাধারণত ভেড়ার রোগবালাই খুব একটা দেখা যায় না। বিভিন্ন রোগসমূহের মধ্যে পরজীবীজনিত রোগ যেমন চর্মরোগ, লোম উঠা ইত্যাদি দেখা যায়। তাছাড়াও কিছু কিছু রোগ যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পিপিআর, কন্টাজিয়াস একথাইমা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। ভেড়ার খামারের জন্য বছরব্যাপী ডিওয়ার্মিং, ডিপিং ও ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচী নিকটস্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী পালন করতে হবে।

হাঁস পালন

হাঁস পালন করলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে, পুষ্টির অবস্থার উন্নয়নে তথা দারিদ্র্যবিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল হাওর-বাওড়, পুকুর-ডোবা হাঁস পালনের উপযোগী। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে তার খাদ্য চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি পূরণ করে থাকে। দেশে প্রচুর খাল-বিল নদী-নালা আছে, তাই একজন খামারি সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান হাঁস পালন এলাকা হচ্ছে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও এর আশপাশের নিচু এলাকা।

ছবি : হাঁস পালন

এ সমস্ত এলাকায় সচরাচর যে সমস্ত হাঁসের জাত দেখা যায় সেগুলো হলো খাকি ক্যাম্বেল, দেশি, জেন্ডিং, ইন্ডিয়ান রানার ইত্যাদি।

বাসস্থান : হাঁস আবদ্ধ, অর্ধ আবদ্ধ; ছেড়ে, হারডিং এবং ল্যানটিং পদ্ধতিতে পালন করা যায়। হাঁস খুব বেশি গরম ও খুব বেশি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না তাই হাঁসের ঘরের জন্য সাধারণত খোলামেলা উঁচু ও রোদ থাকে এমন জায়গা বাসস্থানের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

রোগবালাই: হাঁসের ২টি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা। এ দুটি রোগের ভ্যাকসিন সময়মতো ও পরিমাণমতো দিলে এর প্রকোপ হতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

মুরগি পালন

পারিবারিক আমিষ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবার হাঁস-মুরগি পালন করে আসছে। বর্তমান দেশের বেকার সমস্যার সমাধান, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃস্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সর্বোপরি দেশের দারিদ্রবিমোচনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালনে অবদান রাখছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে ডিম পাড়া মুরগির জাত "শুভ্রা" আবিষ্কার হয়েছে। এটি খামারি পর্যায়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি বছরে ২৯০-২৯৪ টি ডিম দেয়।

ব্রয়লার স্ট্রেইন : স্টারব্রো, ট্রপিকব্রো, ইসা বেডেট, ইসা আই ৭৫৭, ইসা ৭৩০ এমপিকে হাবার্ড ক্ল্যাসিক, গোল্ডেন কমেট, লোহম্যান, ভ্রানকব, কাসিলা, কব ৫০৯ ।

লেয়ার স্ট্রেইন : সোনালি, শেবার ৫৭৯, ইসা ব্রাউন, ইসা হোয়াইট, লোহম্যান ব্রাউন, লোহম্যান হোয়াইট হাইসেক্স ব্রাউন হাইসেক্স হোয়াইট ।

বাসস্থান : দেশি মুরগি সাধারণত ছেড়ে পালন করা হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্রয়লার বা লেয়ার আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়ে থাকে। আবদ্ধ অবস্থায় এদর মেঝে বা ফ্লোর এবং মাচা পদ্ধতিতে পালন করা হয়।

ছবিঃ শুভ্রা মুরগি

খাদ্য : ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগিকে বাণিজ্যিক উপায়ে তৈরিকৃত স্টারটার (বাচ্চার খাদ্য), গ্রোয়ার (বাড়ন্ত মুরগির খাদ্য) এবং ফিনিশার (বয়স্ক মুরগির খাদ্য) খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

এছাড়া মুরগির উৎপাদন এবং বয়সের ভিত্তিতে অনেকে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান (গম, ভুট্টা, কুঁড়া, প্রোটিন কনসানট্রেট, খৈল, ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ, লবণ) একত্রে মিশিয়ে খাবার তৈরি করে মুরগিকে সরবরাহ করে থাকে।

রোগ বালাই : মুরগির বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির মধ্যে গামবোরো, রানীক্ষেত, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু মারাত্মক রোগ। নিয়মিত টিকাদান এবং খামারের জীবনিরাপত্তার মাধ্যমে এসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

গবাদি পশুর রোগব্যাধি

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন আমাদের দেশের মানুষের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন প্রকার রোগ আয় বৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর ২৫% গবাদি পশু বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে রোগ-ব্যাধি হতে পারে যেমন ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, পরজীবীর আক্রমণ, অপুষ্টি, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রুটি, বিপাকীয় রোগ, বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

গবাদি পশুর রোগ :

গবাদি পশুর বহু ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এগুলোকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করতে পারি, যেমন-
১) সংক্রামক রোগ ২) অপুষ্টিজনিত রোগ ৩) পরজীবী ঘটিত রোগ ৪) বিপাকীয় রোগ

সংক্রামক রোগ	:	যেসকল রোগ অসুস্থ প্রাণীর দেহ হতে সুস্থ প্রাণীর দেহে সংক্রমিত হয় তাকে সংক্রামক রোগ বলে। গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের মধ্যে সংক্রামক রোগ বেশি মারাত্মক। এসব সংক্রামক রোগ কিছু ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে।
ভাইরাস জনিত রোগ	:	ক্ষুরারোগ, পিপিআর, জলাতঙ্ক, পো-বসন্ত,
ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ	:	তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা, নাভীরোগ, ওলান প্রদাহ, নিউমোনিয়া।
অপুষ্টিজনিত রোগ	:	খনিজ পদার্থ যেমন ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন, কপার, কোবাল্ট ভিটামিন যেমন ভিটামিন-এ, বি, ডি, ই ইত্যাদির অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগসমূহ হয়ে থাকে।
পরজীবী জনিত রোগ	:	রক্তামাশয়, ব্যাবেসিওসিস, কলিজা কৃমির সংক্রমণ, গোল কৃমির সংক্রমণ, ফিতা কৃমির সংক্রমণ, কাঁধে ঘা বা হাল্প সোর, বহিঃপরজীবীর (উকুন, আঠালী ও মাইট) আক্রমণ ইত্যাদি
বিপাকীয় রোগ	:	শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ বা বিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে এই সকল রোগ হয়ে থাকে। যেমন: পেট ফাঁপা, দুধজ্বর।

তড়কা বা এনথ্রাক্স

এটি একটি গবাদি পশুর ব্যাকটেরিয়াল রোগ। রোগটি পশু থেকে মানুষে ছড়াতে পারে। পেট ফাঁপা, গর্ভপাত, নাক, মুখ, প্রশ্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায় ও শরীরের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ হয়।

চিত্র: নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

আক্রান্ত পশুকে সঠিক সময়ে এনথ্রাক্স রোগের টিকা প্রদান করতে হবে, অসুস্থ প্রাণী থেকে সুস্থ প্রাণীকে আলদা করতে হবে। মৃত পশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

ক্ষুরারোগ বা ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ :

ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত প্রাণীর জিহ্বা ও পায়ের ক্ষুরের ফাঁকে ফোস্কা পড়ে ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়, লালা ঝরে, খাদ্য গ্রহণ ও উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। নিয়মিতভাবে এফএমডি রোগের টিকা প্রদান করা, আক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী থেকে পৃথক করা, আক্রান্ত প্রাণীর ব্যবহার্য খাবারের পাত্র, স্থান কীটনাশক দিয়ে ভলোভাবে ধৌত করা এবং মৃত প্রাণীকে গভীর গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

চিত্র : পায়ে ক্ষত

ছাগলের পিপিআর বা গোট প্লেগ

পিপিআর ছাগল ও ভেড়ার ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। আক্রান্ত ছাগলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হয়, নাক দিয়ে প্রচুর তরল পদার্থ বের হয় এবং ছাগল মারা যায়। রোগ দেখা দেয়ার আগেই সুস্থ ছাগলকে পিপিআর টিকা দিতে হবে। এ রোগে আক্রান্ত মৃত ছাগলকে পুড়িয়ে অথবা নিরাপদ দূরত্বে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিত্র: পিপিআর আক্রান্ত ছাগলের চোখ

পরজীবী সংক্রমণ

কলিজা কৃমি, গোল কৃমি ইত্যাদি পরজীবীর সংক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এসব পরজীবী পোষক দেহ হতে পুষ্টি, রক্ত শোষণ করে এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে যেমন- ফ্যাসিওলিয়াসিস, রক্তাল্পতা, রক্ত আমাশয় ইত্যাদি। নিয়মিতভাবে কৃমিনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে পরজীবীর সংক্রমণ কমানো যায়।

ছবি : আক্রান্ত ছাগলের ফিতাকৃমি

হাঁস-মুরগির রোগ :

রানীক্ষেত

রানীক্ষেত একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। ঝিমানো, খাবারে অরুচি, চুনা পাতলা পায়খানা, মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, ঘড়ঘড় শব্দ করা এ রোগের লক্ষণ। খামারের মানসম্মত জীবনিরাপত্তা ও টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ছবি : ঝিমানো অবস্থায় মুরগি

গামবোরো

ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। ৩-৬ সপ্তাহের মুরগির বাচ্চায় দেখা দেয়। মুরগির পালক উসকো-খুসকো থাকে। মুরগির মধ্যে ঝিমানো ভাব দেখা যায়, দেহে তাপমাত্রা বেড়ে যায় । পা খোঁড়া হয়ে যায়। মুরগির পা ও রানের মাংসের উপর রক্তের ছিটা দেখা যায়। গামবোরো রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করতে হবে।

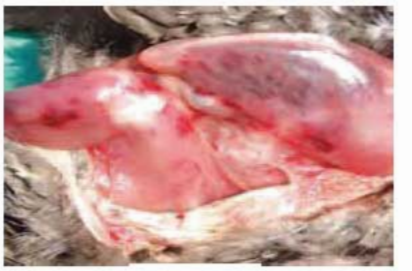

ছবি:গামবোরো

ডাক প্লেগ

ডাক প্লেগ ভাইরাসজনিত হাঁসের একটি ছোয়াচে রোগ। মৃত্যু হার ৮০-৯০ ভাগ। আক্রান্ত হাঁসের চোখ দিয়ে পানি ঝরে, ঘোলা, নীলাভ ও মাঝে মাঝে সবুজ পায়খানা করে, পা অবশ হয়ে যায় এবং ঝিমায়। রোগ প্রতিরোধে ডাক প্লেগের ভ্যাকসিন দিতে হবে।

ছবি:ডাক প্লেগ আক্রান্ত

ডাক কলেরা

ডাক কলেরা হাঁসের একটি ব্যক্টেরিয়াজনিত রোগ। ঘনঘন তরল পায়খানা হবে। মৃত্যু হার ৮০-৯০ ভাগ। ডাক কলেরার ভ্যাকসিন দিতে হবে।

ছবি:ডাক কলেরা আক্রান্ত

নবম অধ্যায়

নিরাপদ খাবার

যে খাবার সঠিক ও নিরাপদ উপায়ে উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত , বাজারজাত ও সংরক্ষণ করা হয় এবং খাদ্যে রোগ-জীবাণুর উপস্থিতির ঝুঁকি কম থাকে তাকে নিরাপদ খাবার বলে।

নিরাপদ খাবারের বৈশিষ্ট্য

১. বাসি-পচা, ছত্রাক ও মাছি পড়া বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার দ্রব্য বা উপকরণ থাকবে না ।

২. মিষ্টি, জিলাপিসহ অন্যান্য খাবার এ অননুমোদিত কোনো প্রকার রং থাকবে না।

৩. ফল যেমন টমেটো, কলা, পেঁপে, আম পাকাতে শুধু ইথোফেন (২-ক্লোরো ইথাইল ফসফনিক এসিড) নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. ফল বিশেষ করে আম পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করা বা এর উপস্থিতি থাকবে না।

৫. মাছে ফরমালিন গ্রহণযোগ্য নয়। সেজন্য মাছ কাটার পর কয়েকবার পানি বদল করে পরিষ্কার পানিতে ভালো করে মাছ ধুয়ে নিয়ে রান্না করতে হবে।

৬. নিরাপদ পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হবে। ভালো হলো পানি ফুটিয়ে পান করা।

৭. যে সমস্ত খাদ্য রান্না না করে সরাসরি খাওয়া হয় যেমন: সালাদ, বিভিন্ন সবজি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খাওয়া।

খাবার নিরাপদ রাখার পদ্ধতি

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

- খাবার তৈরির সময় হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
- খাবার বাসন, বাটি, ছুরি , কাচি ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিতে হবে।
- খাবার পোকামাকড় মুক্ত ও রান্নাঘর সর্বদা স্যাতস্যাতে ও পোকামাকড় মুক্ত রাখতে হবে।
- হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখতে হবে ।

২. কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখা

- রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ, মাংস, সবজি আলাদা রাখতে হবে ।

- মাছ-মাংস ও সবজি কাটার জন্য মরিচা বিহীন বঁটি ব্যবহার করতে হবে।
- ঢাকনা যুক্ত পাত্রে রান্না করা খাবার রাখতে হবে ।

৩. খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করা

- মাংস, ডিম ও সামুদ্রিক খাদ্য ভালো করে সিদ্ধ করে রান্না করা।
- খাবার পুনরায় গরম করার সময় ভালোভাবে গরম করা।
- দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করা।

৪. খাদ্য-সামগ্রী সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা

- রান্না করা খাবার ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ২ ঘণ্টার বেশি না রাখা।
- ফ্রিজে লম্বা সময় খাদ্য সংরক্ষণ না করা।
- শিশুদের খাবার টাটকা খাওয়ানো
- রান্নায় ব্যবহৃত খাবার তেল পুনরায় ব্যবহার না করা ।

৫. নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা

- টিউবওয়েল ও ফুটানো পানি নিরাপদ।
- মানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী ব্যবহার করা।
- ফলমূল, শাক-সবজি খাওয়া বা রান্নার পূর্বে ধোয়ার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

এক নজরে খাদ্য নিরাপদ রাখার মূল চাবিকাঠি

১ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি

পরিচ্ছন্নতার প্রথম ধাপ সাবান দিয়ে ধোব হাত

পরিচ্ছন্ন থালা-বাসন রাখবে সুস্থ সবার জীবন

২ কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখি

কাঁচা মাছ-মাংস, ফলমূল ও শাক-সবজী থেকে আলাদা রাখি

কাঁচা ও রান্না করা খাদ্য আলাদা রাখি

৩ সঠিকভাবে রান্না করি

সঠিক তাপে ভালভাবে সিদ্ধকরে রান্না করি

৪ নিরাপদ তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করি

রান্না করা খাবার ৫° সেঃ এর নিচের তাপমাত্রায় (ফ্রিজে) সংরক্ষণ করি

সংরক্ষণ করা খাবার পরিবেশনের আগে ভালভাবে গরম করি

৫ নিরাপদ পানি ও খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করি

নিরাপদ উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করি

পানি ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করে খাই

ফলমূল ও শাক-সবজী নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে নেই

৬ **রান্না বা ভাজা পোড়ায় ব্যবহৃত তেল পুনরায় ব্যবহার না করি**

দশম অধ্যায়

কৃষি প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন

কৃষিতে গবেষণার বহুবিধ বিষয় রয়েছে। গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োগের ফলেই কৃষির অগ্রগতি সাধিত হয়। অর্থনৈতিক ও কারিগরি দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিখাতের প্রধান গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে (১) ফসল (২) মৎস্য (৩) পশু সম্পদ (৪) বন ও (৫) পরিবেশ যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষণার অনেক বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং গবেষণার সকল অর্থ যোগান দেয় সরকার । বাংলাদেশে মোট ১৩টি সরকারি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার অনেকগুলোই ফসল ভিত্তিক (ধান, পাট, আখ, চা ইত্যাদি)। এসব প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম

বাংলদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২ এর আওতায় বিএআরসিকে সর্বোচ্চ সংস্থা এবং ১২টি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে বিএআরসির সংবিধানিক ইউনিট হিসাবে গণ্য করে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম- National Agricultural Research System- (NARS) পুনর্গঠিত হয়।

নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা ২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ৩. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা ৫. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ ৬. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা ৭. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা ৮. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ ৯. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার ১০. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম ১১. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৌলভিবাজার ১২. তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৩. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী ।

বাংলাদেশের কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক) গবেষণা সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল একটি গভর্নিং বডির মাধ্যমে নার্সের নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের

কর্মকাণ্ডকে গতিশীল ও জবাবদিহিতামূলক করার উদ্দেশ্যে সংশোধিত সর্বশেষ আইনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলকে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতাও অর্পণ করা হয়েছে।

২.বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭৬ সালে গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সর্ববৃহৎ এই কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ১৬টি বিভাগ এবং ৭টি গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৩০টি উপকেন্দ্র। বিএআরআই দু'শ'র বেশি ফসল নিয়ে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন শস্যের ৪৫১টি উন্নত জাত এবং ৪৪২ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ৮৯৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার আওতায় শস্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, চীনা, কাউন, ডালশস্য, তেলফসল, কন্দাল জাতীয় ফসল, ফল, ফুল, সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল অন্যতম।

৩. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

দেশের প্রধান খাদ্য ধানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ১৮টি গবেষণা বিভাগসহ ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এ যাবত বিভিন্ন মৌসুমের উপযোগী চারটি হাইব্রিড ধানসহ ৭২টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা এবং পাটের বহুমুখী পণ্য উদ্ভাবন ও উন্নয়ন-এর উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪০টি উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে ১৬টি জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে।

৫. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ময়মনসিংহে স্থানান্তর করা হয়। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় পরিবর্তন করে অধিক ফলনশীল ও মানসম্মত ধান, পাট, তৈলবীজ, ডাল ও সবজি জাতীয় শস্যের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ যাবৎ ১২টি ফসলের ওপর ৮২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ক্রমবর্ধমান গুড় ও চিনি শিল্পের জন্য ইক্ষু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫১ সালে ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আখ চাষ দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার জন্য উপযোগী এক নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল। গুড় বা চিনির ওপর নির্ভর করেই দেশের রসনা তৃপ্তকারি মিষ্টি জাতীয় বিভিন্ন খাবার তৈরি হয়ে থাকে। এ যাবৎ ইনস্টিটিউট ৪১টি ইক্ষুর জাত উদ্ভাবন করেছে।

৭. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

১৯৬১ সালে যাত্রা করে কয়েকবার নাম পরিবর্তনের পর ১৯৮৩ সালে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটউট নামকরণ করা হয় । ইনস্টিটিউট মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার এবং মৃত্তিকা পরিবেশ সুরক্ষায় সরাসরি কৃষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মাঠপর্যায়ে সেবা প্রদান করে থাকে।

৮. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

মৎস্য সম্পদের গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারটি গবেষণা কেন্দ্র এবং চারটি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে মিঠা পানি ও লোনা পানিতে মাছ চাষের ওপর বিভিন্ন সফল প্রযুক্তি হস্তান্তর করে উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

৯. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, প্রাণিজ কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিএলআরআই ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জাত উন্নয়ন, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও পরামর্শ-সেবা প্রদান করছে। গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিএলআরআই ৬৩ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। দেশের আবহাওয়া উপযোগী প্রথমবারের মত বছরে ২৯০ টি ডিম উৎপাদনে সক্ষম নতুন লেয়ার মুরগির জাত শুভ্রা উদ্ভাবন করে খামারি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমিষের ঘাটতি পূরণে মুরগির পাশাপাশি হাঁসের জাত উন্নয়ন করা হয়েছে।

১০. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ দুটি উইং-এর অধীনে ১৭টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে বনজ সম্পদের বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, বাঁশ, বেত, ভেষজ উদ্ভিদ ও অকাষ্ঠল সম্পদের উন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহার ইত্যাদির লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১১. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদিত চা-এর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট যাত্রা শুরু করে। এই ইনস্টিটিউট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং বিএআরসির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও গুণগত মান সম্পন্ন ১৮টি ক্লোন উদ্ভাবন, বাইক্লোনাল ও পলিক্লোনাল বীজ উদ্ভাবন করেছে।

১২. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন, তুঁতচাষ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, পলু পালন কলাকৌশল, রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯টি উচ্চ ফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৩. তুলা উন্নয়ন বোর্ড

তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে গবেষণা বিশেষ করে উন্নত জাত উদ্ভাবন, সম্প্রসারণের কাজ করছে। বীজ উৎপাদন ও বিতরণ এবং বাজারজাতকরণ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

খ) অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন তেমন কোনো পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একীভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ঢাকার খামারবাড়িতে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে প্রশাসন ও অর্থ উইং, সরেজমিন উইং, ক্রপস উইং, হর্টিকালচার উইং, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, প্রশিক্ষণ উইং, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর মাধ্যমে দেশব্যাপী এর কার্যাক্রম পরিচালনা করছে।

২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার দিলকুশায় অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কৃষি খাতের অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হতে কার্যক্রমের দিক থেকে ভিন্নতর বিবেচিত হওয়ায় ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং সেবা কর্পোরেশন (বিএআইএসএসসি) হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৬ সালে পুনরায় এর নাম পরিবর্তন করে বিএডিসি করা হয়।

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

কৃষি বিপণন উপদেষ্টা বিপণন বিভাগ নামক প্রকল্পের আওতায় যাত্রা শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪৩ সালে স্থায়ী ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্প অধিদপ্তরের অধীনে কৃষি বিপণন বিভাগ নামে পূনর্গঠন করা হয়।
তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালে, কৃষি, সমবায় এবং ত্রাণ অধিদপ্তরের অধীনে কৃষি বিপণন পরিদপ্তরের অনুমোদন দেয় পরবর্তীতে ১৯৬০ সালে, প্রাদেশিক পুনর্গঠন কমিটি কৃষি বিপণন পরিদপ্তরের উপ-বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে লোকবল নিয়োগের অনুমোদন দেয়। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর করা হয়।

৪. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালে বীজ অনুমোদন সংস্থা নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে এর বর্তমান নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম

কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে বিদ্যালয়-বহির্ভূত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কর্মজীবী মানুষদের তাদের কর্মস্থলে শিক্ষিত করে তোলা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা বা সেবা যা কৃষকদের খামার পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নসহ উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। সম্প্রসারণ একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান যেখানে মানুষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে সম্প্রসারণ শিক্ষার সাথে যেসব পেশা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়েছে তা হলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বন অধিদপ্তর, রেশম বোর্ড, চা বোর্ড, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া/কুমিল্লা ও কৃষি তথ্য সার্ভিস ।

গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংযোগ

সম্প্রসারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির জ্ঞান ও দক্ষতায় পরিবর্তন আনয়ন করা। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষকদের তাদের সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন করে তার স্থলে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে কৃষক ক্রমাগতভাবে উন্নত জাতের বীজ, সুষম সার, সেচ, বালাইনাশক ব্যবহার করে পরিবর্তন আনছে। কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে জনগনের চাহিদা নিরূপন ও চাহিদা পূরণের উপায় শেখানো; ব্যক্তির ও নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটানো। মানুষের জানা ও শেখার শেষ নেই। তাই কৃষি সম্প্রসারণ একটি অবিরাম শিক্ষা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষকের উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গ্রহণোপযোগী আকারে দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া ও ব্যবহারে সহযোগিতা করা হয়। জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে অর্থাৎ তাদের সমস্যার সমাধান দিতে প্রয়োজনীয় সেবা ও প্রযুক্তি যথাসময়ে ধারাবাহিক ও অব্যাহতভাবে তাদের মাঝে পৌঁছাতে হয় ও যথানিয়মে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া দেখিয়ে দিতে হয়। এ প্রক্রিয়ার একটি অংশ হচ্ছে সম্প্রসারণ আর অপর অংশটি হচ্ছে গবেষণা। সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের তথা কৃষকের সমস্যা চিহ্নিত করে যেগুলোর সমাধান দিতে সম্প্রসারণ কর্মী অপারগ সেগুলো গবেষণাগারে পৌছে দেয়া হয়। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংগ্রহ করে কৃষকদের গ্রহণ উপযোগী আকারে তাদের নিকট পৌছে দেওয়ার কাজ সম্প্রসারণ কর্মীকে করতে হয়।

সম্প্রসারণ ও গবেষণার মধ্যে প্রযুক্তিগত তথ্যের আদান প্রদান নিশ্চিত করার কার্যপদ্ধতি :

- গবেষণা, সম্প্রসারণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি খাতের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি জাতীয় কৃষি কারিগরি কমিটি কাজ করছে;

- একই কৃষি পরিবেশভুক্ত জেলার সম্প্রসারণ সংস্থার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কাজ করছে।

অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের নিয়ে গবেষণা সম্প্রসারণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

২০১৯

শিক্ষাবর্ষ

সম্পূরক কৃষিশিক্ষা

৬ষ্ঠ-৮ম

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সুন্দর আচরণই পুণ্য

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক সংকলিত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত